জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে

দলের একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে কমরেড শিবদাস ঘোষ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তথা মার্কসবাদের মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করেন। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি কীভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সমস্ত দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বলেন যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মর্মবস্তু হল, এটি একটি গাইড টু অ্যাকশন যা মানুষকে ক্রিয়ায়, জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। জীবনের সর্বক্ষেত্র ব্যাপ্ত করে সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে নিজেকে দূরে রেখে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঠিক উপলব্ধি একেবারেই অসম্ভব।

কমরেডস্,

আমাদের এই রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এ বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রথমেই আমাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। তা হচ্ছে, আমরা জানব কেন, বা আমাদের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য কী এবং সত্যিকারের জ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি? আমরা না হয় জানলাম না। আমরা যদি কিছুই না জানি, না বুঝি, তাহলে কী আসে যায়? না জানলে কী হয়? না, না জানলে আমাদের চলে না। না জানলে আমরা এক পা-ও এগোতে পারি না, সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি না, পরিবেশকে জয় করতে পারি না, প্রকৃতিকে বশ করতে পারি না, প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করে কাজে লাগিয়ে জীবনকে সুন্দর করতে পারি না। ফলে আমি মনে করি, জ্ঞানের সাথে যদি জীবনের প্রশ্ন জড়িত না থাকে, জীবনকে প্রভাবিত করার জন্য যদি তার দরকার না থাকে, যে জ্ঞান আমরা অর্জন করলাম সেটা যদি জীবনে প্রয়োগই না করি, তাহলে জ্ঞানচর্চা না করলেই বা ক্ষতি কী? দ্বিতীয়ত, যথার্থ জ্ঞান সংগ্রাম থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আমাদের এই উপলব্ধিটা কোথা থেকে এল? যখন থেকে মানুষ এসেছে তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামকে অনুধাবন করে এই সত্যোপলব্ধিটা আমাদের এসেছে।

জ্ঞান সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়

আমরা জানি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। যেদিন থেকে মানুষ এই সংগ্রাম শুরু করেছে সেদিন থেকে মানুষের মধ্যে কণামাত্র হলেও চিন্তার জন্ম হয়েছে, আইডিয়া-র জন্ম হয়েছে এবং প্রাথমিক অবস্থায় সেদিন মানুষের মধ্যে যতটুকু চিন্তার জন্ম হয়েছে সেই ততটুকু চিন্তাকে অবলম্বন করেই মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে সেদিন লড়াই করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বের ফলেই জ্ঞানের সৃষ্টি। আদিম যুগের শুরুতে মানুষ যে লড়েছে সেটা বাঁচার তাগিদেই লড়েছে। তখনও তাগিদটা ছিল মুখ্যত জৈবিক। তখন সেনসেশন টু মোটর অ্যাকশন-এর স্তর পার করে মানুষের মস্তিষ্কে চিন্তাশক্তির জন্ম হলেও, এমনকী চিন্তার ভ্রূণ বা এলিমেন্ট অব আইডিয়া-র জন্ম হলেও, তখনও সে মুখ্যত প্রাণের চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই বাঁচতে চেয়েছে। জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে যে নিয়ম কাজ করে, অর্থাৎ সারভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট (যোগ্যতমের বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকা), মানুষও সেই গোড়ার যুগে অনেকটা সে নিয়মের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। লড়াই নেই, সংগ্রাম নেই, অথচ ভাব আছে, চিন্তা আছে, জ্ঞান আছে, এমনটা তো বাস্তবেই সম্ভব নয়। তাহলে ভাব আসছে সংগ্রামের ফলে। সংগ্রাম থেকে ভাবের জন্ম, জ্ঞানের সৃষ্টি। তাহলে সংগ্রাম থেকে জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হবে কী করে? বিচ্ছিন্ন হলেই তার মৃত্যু।

এই চেতনার ভিত্তিতেই মার্কসবাদ প্রথম বলল, যে জ্ঞান নিস্পৃহ, নিষ্কর্মা, যে জ্ঞান সংগ্রাম করতে শেখায় না, নিজেকে পরিবর্তন করতে শেখায় না, প্রকৃতিকে ও দুনিয়াকে পাল্টাতে সাহায্য করে না সে জ্ঞান নিষ্ফলা জ্ঞান, সে জ্ঞানের নামে জঞ্জাল। সেটা আয়ত্ত করা উচিত নয়। সেটা শুধু মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করবে, কর্মক্ষমতা

কেড়ে নেবে, মানুষকে অসহায় করে ফেলবে। দেখুন, মার্কসবাদ নিছক একটা নিরীশ্বরবাদী দর্শন নয়। সে ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরভক্ত এই দুনিয়ায় কোন সেই শক্তি যার জোরে সে মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিল, যার থেকে হাজার হাজার বছরের কুসংস্কারও মানুষকে আটকে রাখতে পারল না ? কোন সেই শক্তি যার জোরে এত বাধাবিপত্তির মধ্যেও মানুষ বেরিয়ে এসেছে সেই সংস্কারের জাল ছিঁড়ে ? না, জীবনের প্রয়োজন। বাঁচবার জন্য মানুষকে লড়তেই হবে। যে মানুষ এগোতে চাইবে, বাঁচতে চাইবে, তার শক্তির দরকার। এমন জ্ঞান অর্জন করা দরকার যে জ্ঞানের সাহায্যে সে সংগ্রামী হয়, নিজেকে পাল্টায়। আর নিজেকে পাল্টাতে পারলে সে দুনিয়াকেও পাল্টাতে পারে। তাই যথার্থ জ্ঞান সংগ্রাম থেকে বাস্তবে কখনই বিচ্ছিন্ন নয়, ক্রিয়ার থেকে বিচ্যুতি বাস্তবেই তার নেই। তাহলে এমন জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে যার দ্বারা সমস্ত সমস্যার চুলচেরা বিচার করা যায়। ফলে জ্ঞানকে যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেই জ্ঞানই আমাদের আয়ত্ত করতে হবে যে জ্ঞান পরীক্ষিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার, তা হচ্ছে, দুনিয়ায় এতসব মতবাদ থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে আমরা বিশেষ করে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করব কেন ? সাধারণভাবে এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, যেহেতু আমরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে মনে করি এবং মার্কসবাদী হতে চাইলে যেহেতু মার্কসবাদের দর্শনগত যে ভিত্তি, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সকলকেই ভাল করে আয়ত্ত করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয় এবং জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে তাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সেই কারণেই আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করছি। কথাটা এভাবে বললে মনে হতে পারে, যারা মার্কসবাদী একমাত্র তাদের কাছেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আলোচনার মূল্য আছে। কেউ যদি মার্কসবাদ জানতে বা গ্রহণ করতে না চান, বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে না চান তাহলে তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ জানবার বা বোঝবার কোনও প্রয়োজন নেই। আবার কেউ মনে করতে পারেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও আর পাঁচটা দর্শনের মতোই সাধারণ একটি দর্শনমাত্র। আর পাঁচটা দর্শন যেমন মানুষ জানে, অনেকটা সেরকম মানসিকতা নিয়েও অনেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ জানতে চাইতে পারেন। আমি এইসব ধারণাকে কোনও দিনই সঠিক বলে মেনে নিতে পারিনি। আমি মনে করি, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শেখবার প্রয়োজনীয়তা অন্যত্র। কারণ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই বর্তমান যুগে মানুষের হাতে একমাত্র হাতিয়ার যার সাহায্যে মানুষ সমস্ত ধরনের সমস্যার উপর সঠিকভাবে আলোকপাতকরতে পারে বা সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। ফলে আমরা যেহেতু সত্য জানতে চাই — জীবন সম্বন্ধে, বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে সত্যোপলব্ধি করতে চাই, সেই কারণেই আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের চর্চা করছি। আর সত্যানুসন্ধানের জন্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনুসন্ধান ও চর্চা করি বলেই বা সেই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হই বলেই আমরা মার্কসবাদী।

সত্য জানব কী করে

একথা ঠিক, সত্য জানবার উপায় নিয়ে মতভেদ আছে। সত্য জানবার উপায় সংক্রান্ত যে শাস্ত্র — অর্থাৎ চিন্তা বা ভাবের উৎস কী, ভাব ও বস্তুর মধ্যে কোনটা প্রায়র, অর্থাৎ কোনটা আগে, বাস্তবকে চিন্তা কীভাবে প্রতিফলিত করছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী, সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করার প্রশ্নেই বা চিন্তা ও ভাবের ভূমিকা কী, কীভাবে সমস্ত ক্ষেত্রেই কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় — সত্য জানবার সেই শাস্ত্রটিকেই বলা হয় থিওরি অব নলেজ (জ্ঞানতত্ত্ব)। অর্থাৎ যে কোনও ঘটনাকে বিচার করার পদ্ধতি কী হবে, কীভাবে তার যথার্থ চরিত্র আমরা নির্ণয় করতে পারি, কীভাবে সত্য জানতে পারি, সত্য জানবার পদ্ধতি কী, এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো থিওরি অব নলেজ-এর বিচার্য বিষয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিজেই এ ব্যাপারে একটা বিশেষ জরুরি প্রশ্ন তুলে ধরেছে। তাহল ঘটনার বিচার, ভাবের বিচার আমরা নিশ্চয়ই করব, কিন্তু আমাদের সেই বিচার সঠিক কি বেঠিক, সত্য কি অসত্য, এটা বুঝব কীভাবে? সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমাদের বিচারের পদ্ধতি কী হবে ? মার্কসবাদীদের মতে সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে সঠিক বিচারের পদ্ধতি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি। একথার উত্তরে কেউ বলতে পারেন, মার্কস বলেছেন বলেই কি সেটা মেনে নিতে হবে? আমাদের দেশের শংকরাচার্য কি কম জ্ঞানী ? তিনি তো মায়াবাদে বিশ্বাসী। তিনি তো

দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতির কথা বলেননি। এ সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলছে, যে যাই বলুক সেটা সঠিক কি বেঠিক সেই প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমাদের আর একটু গোড়ায় যাওয়া দরকার। সেটা হল, কে জানছে এবং কী জানছে ? আমরা জানি, জানছে মানুষ, জানছে বহির্বিশ্বকে, জানছে দুনিয়াকে। জানছে বস্তুজগৎ সম্পর্কে, জানছে তার পরিবেশ সম্পর্কে। জানছে কোথায় সে অবস্থান করছে, কীভাবে সে অবস্থান করছে, কী পরিবেশে অবস্থান করছে, বা এই বিশ্বজগৎটা কীভাবে চলছে এবং সেই চলার নিয়মের প্রভাব তার জীবনে কী, পরিবেশের উপর কী ? শাস্ত্রকাররা বা পুরনো অধ্যাত্মবাদী দর্শনে বিশ্বাসী যাঁরা বা ভাববাদীরা, এমনকী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরাও বলেন যে, আমরা নিজেকেও জানছি। মানুষ নিজেকেই জানুক, আর বহির্বিশ্বকেই জানুক — কীভাবে জানছে? দীর্ঘকাল ধরে একটা ধারণা ছিল যে, যার সাহায্যে আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের মন, আমাদের অনুভব শক্তি, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান। মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফত বহির্বিশ্বকে যেমনভাবে উপলব্ধি করে, তেমনভাবেই মানুষ তাকে জানে। কথাটা এক অর্থে ঠিক। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই এই ধারণার সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়বে। মনোবিজ্ঞানে ভ্রমদর্শন বলে একটা কথা আছে। যেমন ধরুন, রজ্জুতে সর্পভ্রম। দড়ি দেখে কেউ যদি তাকে সাপ মনে করে তাহলেও দড়িটা দড়িই থাকে, সাপ হয়ে যায় না। অর্থাৎ রজ্জু দেখে সর্পভ্রম হলেও রজ্জুটা রজ্জুই থাকে। সত্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এই ধরনের যে জট দেখা দেয় সেটা এই কারণেই যে, এই চিন্তাধারায় মনই হচ্ছে বিচারের মাপকাঠি। কিন্তু সত্য বাস্তবে মানুষের চেতনা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। ফলে মনের উপলব্ধিকে ভিত্তি করে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করার যে পদ্ধতি এতদিন পর্যন্ত ভাববাদী দর্শনে প্রচলিত ছিল, শুধুমাত্র তার উপর নির্ভর করেই সত্য নির্ধারণ করা চলে না।

বস্তু ও ভাবের মধ্যে বস্তুই প্রায়র, ভাব পরে

বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য আর একটু গোড়ায় যাওয়া দরকার। আমাদের প্রথমেই বোঝা দরকার, দর্শন বলতে আমরা কী বুঝি এবং ভাববাদী দর্শন ও বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা জগৎকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে, তার পরিবর্তনকে, মানবজীবন ও তার সমস্যাবলীকে দেখি বা বিচার করি তাকেই বলা হয় দর্শন। আর একথা সকলেই জানেন, সাধারণত ভাববাদী দর্শন ও বস্তুবাদী দর্শন — মূলত এই দুই ভাগে দার্শনিক চিন্তাকে ভাগ করা হয়ে থাকে। দর্শনের আর একটি জরুরি বিষয় হল, বস্তু ও মানুষের মন। অনেক দার্শনিক একথা স্বীকার করেন যে, মন এবং বস্তু এ দুটোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। এ দুটো একে অপরকে প্রভাবিত করে, দ্বন্দ্বসংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে সাহায্য করে। কিন্তু মন ও বস্তু পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত করছে, ইন্টারডায়ালেকটিক্যালি রিঅ্যাক্ট (পরস্পর দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় একে অপরের উপর ক্রিয়া) করছে, এটুকু বুঝলেই কিন্তু মন ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র ভাল করে বোঝা যায় না। কেন না এরপরেও একটা প্রশ্ন থাকে, তা হচ্ছে, এ দুটোর মধ্যে প্রায়র বা আগে কে? এই প্রায়রিটির প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়রিটির এই ধারণা পরিষ্কার না হলে গোলমাল হবে। বস্তু দ্বারা গঠিত মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়া হচ্ছে মন বা ভাব। সুতরাং মন ও বস্তুর মধ্যে বস্তুই প্রায়র। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থাকে যদি কেউ বস্তু ও ভাবের মধ্যে বস্তুই যে প্রায়র এইটে না বোঝেন, অর্থাৎ ভাব যে বস্তুর একটা প্রোডাকট মাত্র এটা ধরতে না পারেন। আবার ভাব ও বস্তু উভয়ই পরস্পর দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে আছে, একে অপরকে প্রভাবিত করছে — এটা শুধু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরাই বোঝেন, আর কেউ বোঝেন না, এভাবে বললে ভুল হবে। একথা বার্ট্রান্ড রাসেলও বোঝেন, জাঁ পল সার্ত্রেও বোঝেন এবং এরকম আরও অনেকেই বোঝেন। কিন্তু দেখুন, এক্ষেত্রে বস্তুর প্রাইমেসির প্রশ্নটি না বোঝার ফলে কী অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। এ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না থাকার জন্য ফুয়েরবাক হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েও শেষপর্যন্ত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী হয়ে উঠতে পারলেন না, মানবতাবাদী হয়ে গেলেন এবং মানবতাবাদকে শাশ্বত করে ফেললেন। রাসেল নিরীশ্বরবাদী হয়েও ভাববাদী রয়ে গেলেন। সার্ত্রে একজন নিরীশ্বরবাদী হয়েও ভাববাদের চক্কর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সার্ত্রে নিজে পরবর্তী জীবনে এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকেই তিনি একমাত্র কমপ্রিহেনসিভ ফিলজফি (পূর্ণাঙ্গ দর্শন) বলে মনে করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হয়ে পড়লেন একজন অস্তিত্ববাদী বা এগ্‌জিসটেন্‌সিয়ালিস্ট। ফলে রাসেল বা সার্ত্রের মতো মানুষও মার্কসিস্ট, কমিউনিস্ট

বা বিপ্লবী হতে পারলেন না। বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো তাঁরা জানেন। কিন্তু সেগুলোই একমাত্র বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করছে কিনা, এসব প্রশ্নে তাঁদের সংশয় আছে। আবার বাস্তবতা কী, এ ব্যাপারেও এঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। এঁদের চিন্তাধারাটা বিশ্লেষণ করলে এরকম দাঁড়ায় যে, এঁরা সকলেই বিজ্ঞানকে স্বীকার করেন, আধুনিক জীববিজ্ঞানকে স্বীকার করেন, প্রজাতির বিবর্তনের ইতিহাসকেও এঁরা উড়িয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও চিন্তা বা ভাব যে বস্তুর ক্রিয়ার ফল, একটা নতুন সৃষ্টি, একটা নতুন সত্তা হিসেবে ইতিহাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল মানুষ আসার পর — এই জায়গাটা এঁরা সকলে মেনে নিতে পারেননি। এঁদের মধ্যে কারও কারও চিন্তার ধরনটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে, একেবারে আবহমান কাল থেকেই ভাব বস্তুসত্তার মধ্যেই অবস্থান করছে। মানুষ আজ যা চিন্তা করে এবং যেভাবে করে, অর্থাৎ ভাবের যে অভিব্যক্তি মানুষের মধ্যে আজ আমরা পাই, আবহমান কাল থেকে ভাব ঠিক সেই রূপেই বস্তুর মধ্যে ছিল তা নয়, ছিল এলিমেন্ট অব ইনটেলেকট (চিন্তার উপাদান) হিসেবে। মানুষ আসার পর, মানুষের মস্তিষ্ককে ভিত্তি করেই সেই চিন্তার উপাদান যেটা তাঁদের মতে বস্তুর মধ্যেই নিহিত ছিল, তার উন্মেষ ঘটেছে। এই হচ্ছে তাঁদের চিন্তা বা ব্যাখ্যার ধরন। অর্থাৎ তাঁদের মতে আবহমানকাল ধরে যে চিন্তার উপাদান বস্তুর মধ্যে নিহিত ছিল, মানব মস্তিষ্কের মধ্যে এসে সেটা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আজকে মানুষের যে চিন্তা বা ভাবকে আমরা দেখছি সেটা তারই প্রতিফলন। অর্থাৎ চিন্তার উপাদান মানুষের মস্তিষ্কেই পূর্ণ রূপ পেল। ঠিক এই ভাষায় বিষয়টাকে কেউ বলেছেন কিনা সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু তাঁদের চিন্তাকে বিশ্লেষণ করলে মূল কথা এটাই দাঁড়ায়। তাঁদের চিন্তার মূল জটটা হচ্ছে এই জায়গায় যে, তাঁদের কল্পিত চিন্তার উপাদান স্বাধীনভাবে অবস্থান করছে। এইভাবেই সে এসেছে দুনিয়ায়। তাঁদের কল্পিত এই চিন্তার ক্ষমতাটা বস্তুর একটা প্রোডাকট তো নয়ই, এমনকী বস্তুর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নয়। এই কারণেই এইসব চিন্তাবিদরা চিন্তার অ্যাবসোলিউট বা অবাধ স্বাধীনতার ধারণার জন্ম দিয়েছেন। ব্যক্তির স্বাধীনতা কথাটাকে তাঁরা নিরঙ্কুশ অর্থেই ধরেছেন। তাঁদের ভাবখানা হল, কনসেপ্ট অব ফ্রিডম ইজ নট কনডিশনড বাই ইভন সোস্যাল সারকামস্ট্যানসেস, ইট ইজ অ্যাবসোলিউট (স্বাধীনতার ধারণাটা এমনকী সমাজ পরিবেশের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়, এ স্বয়ম্ভু)। এর কারণ হচ্ছে, বস্তু ও ভাবের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায়রিটির প্রশ্নে গোলমাল করে ফেলেছেন। তাঁরা একদিকে যেমন ভাবকে সম্পূর্ণ বস্তু বহির্ভূত মনে করেননি, আবার ভাব যে বস্তুরই ক্রিয়ার ফল, এভাবেও দেখেননি। ধরুন, রেনেসাঁসের যুগে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যেই যদি বিচার করি, সে যুগেই তো গণতন্ত্র ছিল সবচেয়ে অবাধ বা মুক্ত। কিন্তু সেদিনও স্বাধীনতার ধারণাটা নিরঙ্কুশ ছিল না, তার সাথে যুক্ত ছিল যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের ধারণা। এটা এজন্যই ছিল যে, রাষ্ট্রের অ্যাবসোলিউট চরিত্রের ধারণার সেদিন জন্ম হয়নি। কিন্তু আজ যখন পুঁজিবাদ একচেটে পুঁজিবাদ, লগ্নিপুঁজি, সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করেছে এবং রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান ও অ্যাবসোলিউট চরিত্র অর্জন করেছে — সমাজ বিকাশের এই স্তরে এসেই আমরা যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত অ্যাবসোলিউট স্বাধীনতার কথা শুনছি। সার্ত্রের চিন্তায় সেই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের অ্যাবসোলিউট-এর ধারণারই ছাপ পড়েছে।

ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিচারপদ্ধতির পার্থক্য

সত্য জানবার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের মূল পার্থক্যটা কোথায়? মূল পার্থক্য হচ্ছে, দর্শনের এই দুটো ধারার যেটা আগেই বলেছি, একটি মনে করে মনই সত্য নির্ধারক। অর্থাৎ, সত্যের অবস্থানই হচ্ছে মনে। অর্থাৎ, মন যা ভাবছে তা বাস্তবসম্মত কিনা, এ নিয়ে কোনও পরীক্ষা, প্রমাণ বা বিচারের প্রশ্ন এখানে নেই। মনকে এখানে ধরাই হয়েছে স্বয়ম্ভু বা অতিপ্রাকৃত সত্তা হিসাবে। এই চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে দর্শনের যে ধারাটি গড়ে উঠেছে তাকেই আমরা বলি ভাববাদ। সেকারণেই বলছিলাম, মনোধর্মী বা মনোনির্ভর ব্যক্তিউপলব্ধিই হচ্ছে ভাববাদের ভিত্তি। দর্শনের আর একটা ধারা পরীক্ষানিরীক্ষা, বাস্তব জগতের বিজ্ঞানসম্মত বিচার ও ইতিহাসলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যদিও মনের অস্বীকৃতি এখানে নেই। দর্শনের এই ধারাকেই আমরা বলি বস্তুবাদ, বিশেষ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। তবে একথা সত্য নয় যে, সমস্ত ভাববাদী দর্শনই পরীক্ষানিরীক্ষাকে বাদ দিয়েছে। একথা বললে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে। এমন ভাববাদী দর্শনও আছে যা এসবই স্বীকার করে। এমনকী পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যে মনের উপর ক্রিয়া করে, মন, ভাব বা

চিন্তাকে প্রভাবিত করে — এতদূর পর্যন্ত স্বীকার করে এরকম ভাববাদী দর্শনও আছে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও সমস্ত ভাববাদী দর্শনের ক্ষেত্রেই এক জায়গায় ঐক্য বা মিল আছে, তাহল শেষবিচারে মনই সত্য নির্ধারক।

অন্যদিকে ভাববাদী দর্শনের যেমন বহু প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই বস্তুবাদী দর্শনেরও প্রকারভেদ কম নয়। কিন্তু কোনও বস্তুবাদী দর্শনই মনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি, যদিও কোনও কোনও বস্তুবাদী দর্শন মনকে একটা নিছক শারীরিক ক্রিয়া হিসাবে মনে করেছে। অনেকটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা মেকানিক্যালি তারা ভেবেছে। তাদের ধারণাটা হচ্ছে, শারীরিক ক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রধান। মনের স্বীকৃতি তারা দিয়েছে, কিন্তু মনের ভূমিকাকে তারা খাটো করে দেখেছে। যাই হোক, বস্তুবাদী সমস্ত দর্শনেরই মূল সুরে একটা জায়গায় ঐক্য আছে। সেটা হল, মেটিরিয়াল ওয়ার্লড একজিস্টস ইনডিপেন্ডেন্ট অব হিউম্যান কনসাস্‌নেস (এই বিশ্বচরাচর, বস্তুজগত যা কিছু আমরা দেখছি, সমস্ত কিছু মানুষের চেতনা নিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করে)। এই তাদের চিন্তার মূল বুনিয়াদ, যদিও বিচারের ধারা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্তমান।

ফর্মাল এবং ডায়ালেকটিক্যাল লজিকের পার্থক্য

আমাদের মনে রাখতে হবে, কেউ ভাববাদী হন বা বস্তুবাদী হন, তিনি যখন যা বিচার করেন সেই বিচারের ক্ষেত্রে তাঁকে একটা যুক্তিধারা মেনেই সব কিছু বিচার করতে হয়। এই যুক্তি করার যে পদ্ধতি তাকেই ইংরেজিতে বলা হয় লজিক বা সায়েন্স অব লজিক। বাংলায় তাকে তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা জানে, লজিককে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হল ইনডাকটিভ (আরোহ) , আর একটা ডিডাকটিভ (অবরোহ)। বিশেষ ঘটনা থেকে শুরু করে তাকে জেনারেলাইজ (সাধারণীকরণ) করতে করতে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতি, যুক্তিশাস্ত্রের সেই পদ্ধতিকে বলা হয় ইনডাকটিভ লজিক (আরোহ শাস্ত্র)। আর যে সাধারণ সত্য বা ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তার আলোকে কোনও বিশেষ ঘটনাকে বিচার করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় ডিডাকটিভ লজিক (অবরোহ শাস্ত্র)। এখানে আর একটা কথা বোঝা দরকার। ভুল হোক, শুদ্ধ হোক সমস্ত দার্শনিককে এক ধরনের যুক্তিধারার আশ্রয় নিতেই হয়। কিন্তু কেউ যদি লজিকের দোহাই দিয়ে বলেন, এটা সত্য যেহেতু এটা যুক্তিসম্মত, তাহলে বলতে হবে, যুক্তিটা যুক্তিসম্মত হলেই সেটা সত্যকে প্রতিভাত করছে একথা বলা চলে কিনা — কেননা সেটাও বিচারসাপেক্ষ। যে যুক্তিধারাকে আশ্রয় করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান হল সেটা মনগড়া বা ফর্মাল যুক্তিধারার উপর দাঁড়িয়ে আছে কিনা, এসব দিক বিচার না করে যেহেতু এটা যুক্তিসম্মত, সুতরাং এটা সত্যকে প্রতিফলিত করে, এরকম সিদ্ধান্তে এলে তার মধ্যে ফাঁক থেকে যাবে, সঠিক সিদ্ধান্তে আসা গোলমাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সত্য হিসাবে ধরে নেওয়া একটা হাইপথেসিসের (ভ্রান্ত অনুমানের) ভিত্তিতে অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছালেই সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হতে পারে না। বিষয়টিকে আর এক দিক থেকে দেখুন। লজিকের একটা ধারাকে বলা হয় ফর্মাল লজিক। আরোহ এবং অবরোহ মিলেই এটা গড়ে উঠেছে। আর এর ভিত্তিতেই একটা যুগ পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের সামগ্রিক ধারণার উপর গড়ে উঠেছে দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিশাস্ত্র বা ডায়ালেকটিক্যাল লজিক। এই ডায়ালেকটিক্যাল লজিকেও আরোহ এবং অবরোহর পুরো প্রক্রিয়াই কাজ করে। ফর্মাল ও ডায়ালেকটিক্যাল এই দুই বিচারপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী? না, ফর্মাল লজিকে এক একটা ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা হয়, পরিবেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে বিচার করা হয় না, স্ট্যাটিক, স্থির বা নিশ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়। এটাও যে নিরন্তর গতিশীল, এভাবে গণ্য করা হয় না, অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার পারস্পরিক দ্বন্দ্বসংঘাতের রূপে ও গতিশীলতার মধ্যে নয়, আলাদা করে বিচার করা হয়। আর ডায়ালেকটিক্যাল লজিক সেই বস্তু বা ঘটনাকে সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে, পরিবেশের সাথে সম্পর্কের মধ্যে, গতির মধ্যে, অর্থাৎ পরস্পরের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে বিচার করে। অর্থাৎ বস্তু বা ঘটনা, বস্তুময় পরিবেশ এবং এগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে আবিষ্কৃত নিয়মগুলোর কোঅর্ডিনেশন (সমন্বয়) এবং জেনারেলাইজেশন (সাধারণীকরণের) মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিচারধারা গড়ে উঠেছে। এই কারণেই একমাত্র দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিচারধারা প্রয়োগ করেই আমরা কোনও বিষয় সম্পর্কে যথার্থ বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। ফর্মাল লজিকের দ্বারা কোনও বিষয় সম্বন্ধে আমরা আংশিক ধারণা পেতে পারি, কিন্তু সামগ্রিক ধারণা কখনই পেতে পারি না। তাই

মার্কসবাদ বলছে, একটা সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসিদ্ধ মনে হলেই সেটা সাথে সাথে সত্য হয়ে যায় না। এই দিক থেকে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ফিলজফি অব রিজনিং (যুক্তি করার একটা নিছক দর্শন) নয়। আবার তার মানে এ নয় যে, যুক্তিকে সেখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। ডায়ালেকটিক্যাল লজিক প্রয়োগ করে যেকোনও বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সত্য ধারণা অর্জনের জন্য মার্কসবাদই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত হাতিয়ার।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় আমার মনে হয়েছে, সেটা আমি আপনাদের কাছে রাখছি। সকলেই একথা স্বীকার করেন, আরোহ শাস্ত্র এবং অবরোহ শাস্ত্র এই দুটো একে অপরের পরিপূরক, একে অপরকে সাহায্য করে — সাপ্লিমেন্টারি-কমপ্লিমেন্টারি (অনুপূরক-সম্পূরক)। শুধু তাই নয়, মানুষ আসার পর যেমন যেমন চিন্তা করার ক্ষমতা সে অর্জন করেছে তেমন তেমন গড়ে উঠেছে তার যুক্তি করার ক্ষমতা, গড়ে উঠেছে আরোহ ও অবরোহ এই দুটো প্রক্রিয়া। তারা যেমন পরিপূরক-অনুপূরক চরিত্র অর্জন করেছে, আবার একথাও ঠিক, আরোহের মধ্যে অবরোহ আছে এবং অবরোহের মধ্যে আরোহ আছে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। সমস্ত যুক্তিবিদই এগুলো মানেন। কিন্তু যুক্তিবিদদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই আরোহ এবং অবরোহের প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রায়রিটি ধারণা বলে কিছু আছে কি? অর্থাৎ এই দুটো প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন প্রক্রিয়ায় মানুষ চিন্তা করেছে প্রথম ? অর্থাৎ শুরুটা কোনটা — আরোহ, না অবরোহ? কথাটা এখানে সেভাবেই বুঝতে হবে। প্রায়রিটির এই প্রশ্নটা মার্কসবাদী দর্শন ও তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে কেউ এর আগে তুলেছেন বলে আমার নজরে পড়েনি। কিন্তু আমি তুলতে চাইছি। প্রথমত আমরা জানি, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে চিন্তার বিভিন্ন উপাদান গড়ে উঠছে এবং চিন্তার এই বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটে সে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রক্রিয়াতেই চিন্তার বিকাশ হয়। মানুষ আসার পর চিন্তাপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার একেবারে প্রথম অবস্থায় তার সামনে কোনও কিছুই জানা ছিল না। এবং স্বাভাবিকভাবেই চিন্তাপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সেই প্রথম অবস্থায় মানুষের সামনে এমন কোনও সাধারণ সত্য ধারণা গড়ে ওঠেনি যার সাহায্যে বা আলোকে সে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বিচার করতে পারে। ফলে সভ্যতার শুরুতে, আমার মতে, মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াতে লজিকের যে বিচারপদ্ধতি প্রথম কাজ করেছে সেটা প্রধানত আরোহ। তাই আমি বলতে চাইছি, এই দু'য়ের মধ্যে আরোহ হচ্ছে প্রায়র, তার বিকাশের ধারায় এসেছে অবরোহ। অর্থাৎ অবরোহ এসেছে মূলত আরোহের পর। একথা না বুঝলে মেনে নিতে হয় যে, মানুষ প্রথম থেকেই এমন কিছু চিন্তা নিয়ে এসেছে যার সাহায্যে সে অবরোহের রূপেই চিন্তা করতে পারত। এর অর্থ দাঁড়ায়, গোড়া থেকেই চিন্তা কোনও না কোনও রূপে তার মস্তিষ্কে নিহিত ছিল। এভাবে ভাবলে ভাববাদের খপ্পরে পড়তে হয় যার সাথে বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিচারে অন্য সব বস্তুবাদ এক ধরনের ভাববাদ

তবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ছাড়া অন্য কোনও বস্তুবাদী দর্শনই ভাববাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। অর্থাৎ মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে অন্য যেকোনও বস্তুবাদই এক ধরনের ভাববাদ*। অবশ্য একমাত্র মার্কসবাদ গড়ে ওঠার পরই অন্যান্য বস্তুবাদী দর্শনকে এইভাবে বিচার করার প্রশ্ন এসেছে, তার আগে নয়। ভাববাদের ত্রুটি হল, সে বাস্তবকে সঠিকভাবে জানতে পারে না। আর বাস্তবকে সঠিকভাবে জানতে না পারার ফলে মানুষের অগ্রগতি ও বিকাশের লড়াই ব্যাহত হয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান এবং সমাজের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার মধ্যে বন্ধ্যাত্ব আসে, বিকৃতি আসে, বিজ্ঞানের নৈতিকতা গুলিয়ে যায়। এইসব কারণেই ভাববাদ অনিষ্টকর। নাহলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ আমাদের নেই। এমন একটা সুবিধাজনক জিনিস যদি থাকত আমরা বেঁচে যেতাম। ঈশ্বরের মতো কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকলে আমাদের অনেক সুবিধা হত, বোঝাটা অনেক কমে যেত। সব কিছু ঝঞ্ঝাট ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে গিয়ে, ভাববাদকে অস্বীকার করতে গিয়ে আমাদের সংগ্রাম বেড়েছে। একটা বিরাট, জটিল ও মহত্তর সংগ্রামের মধ্যে আমরা পড়েছি। কারণ অসত্য ধারণা নিয়ে আমরা এগোতে পারি না। তাতে পদে পদে বাধা সৃষ্টি হয় ও তা সর্বক্ষেত্রে মানুষের অনিষ্ট সাধন করে। তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ছাড়া বস্তুবাদের অন্য যে সব প্রকারভেদ

---

* এমন ভাববাদী দর্শনও আছে যা নিরীশ্বরবাদী।

আছে সেসব দর্শন বস্তুবাদী দর্শনের ক্যাটিগরির মধ্যে পড়া সত্ত্বেও মার্কসবাদ আসার পর সে অন্যান্য বস্তুবাদী দর্শনের সীমাবদ্ধতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সত্যকে তারা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না। সেই অর্থেই বলা হয়, সেসব বস্তুবাদী দর্শনও এক অর্থে ভাববাদেরই নামান্তর, যদিও এই বস্তুবাদী দর্শনগুলির বিকাশের পথেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এসেছে।

একমাত্র মানুষের মস্তিষ্কই চিন্তাশক্তির অধিকারী

এখন সত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের বিচারের ধারা কী হবে সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আর একটা বিষয় বলে যেতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, আমরা যে চিন্তা করি, বিচার করি, সেই চিন্তা বা বিচার কে করে ? আসলে আমরা আমাদের মস্তিষ্ক দিয়েই বিচার করি, আমাদের মস্তিষ্কই বিচার করে। যে জন্যই বলা হয়, মাইন্ড ইজ এ পার্টিকুলার ফাংশন অব দ্য হিউম্যান ব্রেইন (মন হল মানুষের মস্তিষ্কের এক বিশেষ ক্রিয়া)। যাঁরা জীবজগতের বিকাশ সম্পর্কে খবর রাখেন তাঁরা জানেন, জীবজগতের ক্রমপরিবর্তনের ধারায় স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তু থেকে স্তন্যপায়ী দ্বিপদ জন্তু এসেছে। মানুষ চার পায়ে হাঁটে না। দু'পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটে। এই যে পরিবর্তন ঘটল তার তাৎপর্য গভীর। কেননা দুটো হাত মুক্ত হওয়ার ফলে সে প্রকৃতির সাথে বিশেষভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ পেল। হাতের সাহায্যে সে ফলমূল আহরণ করা থেকে শুরু করে এমনকী উৎপাদন করতে সক্ষম হল। শ্রমের ভূমিকা এসে গেল। এটা মানুষের চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। কিন্তু মানুষের চিন্তাভাবনা গড়েই উঠতে পারত না, যদি না মানুষের মস্তিষ্কের উপরিভাগ বা সেরিব্রাল করটেক্স উন্নত ও বড় না হত। কেননা মনে রাখতে হবে, শিম্পাঞ্জিও কখনও কখনও দু'পায়ে হাঁটে। সে হাত দিয়ে কিছু কিছু কাজও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিম্পাঞ্জি মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে না। পারে না এই কারণে যে, মস্তিষ্কের গঠন যে রকম হলে প্রকৃতির সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে, শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে সেই মেটিরিয়াল কন্ডিশন (বস্তুগত উপাদানই) গড়ে ওঠেনি। এঙ্গেলসের অমূল্য গ্রন্থ 'ডায়ালেকটিকস অব নেচার' বইয়ের মুখবন্ধে মানুষের মস্তিষ্কের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সুন্দর উল্লেখ আছে।

আপনারা সকলেই জানেন, মানুষের মস্তিষ্কের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যার দ্বারা মানুষ চিন্তা করতে পারে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় পাওয়ার অব ট্রান্সলেশন অব দ্য হিউম্যান ব্রেন। মানুষের মস্তিষ্কের উন্নত ধরন, বিশেষ করে উন্নত ও বৃহৎ সেরিব্রাল করটেক্স-এর ফলেই মানুষ এই গুণের অধিকারী। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে মস্তিষ্কের সাহায্যে মানুষ চিন্তা করছে সেই মস্তিষ্ক বস্তু দ্বারা গঠিত। আবার বাইরের বস্তুজগৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করছে এবং এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে মন গড়ে উঠেছে। ফলে এ সমস্ত কিছুই বস্তুরই ক্রিয়ার ফল। তাই মনকে সুপ্রা-ম্যাটার এনটিটি (বস্তু-ঊর্ধ্ব বা বস্তুবহির্ভূত কোনও সত্তা) হিসাবে ভাববার কোনও অবকাশ নেই। একথার অর্থ হচ্ছে, যে মন ভগবান বা ঈশ্বরের চিন্তা করছে সেই মনটাও বস্তুরই ক্রিয়ার ফল। মানুষের ভাবনাচিন্তা সংক্রান্ত বাকি বিশদ আলোচনা আমি পরে করব, কিন্তু এখানে এইটুকুই বলে গেলাম।

চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে কী করে

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মন, ভাব বা চিন্তা মানুষের সমাজে কী করে এল ? মার্কস বলেছেন, "দি আইডিয়া ইজ নাথিং এল্স্ দ্যান দ্য মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড রিফ্লেক্টেড বাই দ্য হিউম্যান মাইন্ড অ্যান্ড ট্রানস্লেটেড ইনটু ফর্মস অব থট" (মানুষের মনে বাস্তব জগতের যে প্রতিফলন ঘটে, চিন্তার আকারে তার প্রকাশই হচ্ছে ভাব)। কিন্তু এই যে প্রতিফলনের কথা বলা হল সেটা তো এমন নয় যে, মস্তিষ্কটা ক্যামেরার নেগেটিভ ফিল্মের মতো, বস্তুজগৎ শুধু তার উপর ছাপ ফেলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এরকম নয়। মস্তিষ্কের কোনও ভূমিকা নেই, সেটা একেবারে নিষ্ক্রিয়, এভাবে ভাবা ঠিক নয়। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এঁরা যখন প্রতিফলন বলেছেন, তখন তাঁরা মস্তিষ্কের ভূমিকাকে নিষ্ক্রিয় বোঝাতে চাননি।* মনে রাখতে হবে, মস্তিষ্ক নিজেই শরীরের এমন একটি

* লেনিন বলেছেন, "The *reflection* of nature in man's thought must be understood not "lifelessly", not "abstractly", *not devoid of movement,* ***not without contradictions***, but in the ... *process* of movement, the arising of contradictions and their solutions." (*Philosophical Notebook, Collected Works*, Vol. 38, p.195)

অঙ্গ যে ক্রিয়া করে অন্যরূপে। আগে মার্কসবাদে প্রতিফলন কথাটা ব্যবহার করা হলেও, আমি এই প্রতিফলন কথাটা ব্যবহার করতে চাই না। আমি প্রতিফলনের পরিবর্তে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাকশন কথাটা ব্যবহার করতে চাইছি। অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কে বহির্জগৎ যে ঘাত-প্রতিঘাত, যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় তার ফলেই ভাব বা চিন্তার জন্ম হয়।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে নিছক প্রতিফলন বললে এবং তা ঠিকমতো না বুঝলে এরকম ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে, প্রত্যেকের মস্তিষ্কে যে চিন্তার জন্ম হচ্ছে সেই সমস্ত চিন্তাই বাস্তবের প্রতিফলন। আর এভাবে বুঝলে বিষয়টা দাঁড়াবে এরকম যে, যেহেতু চিন্তা বাস্তবের প্রতিফলন, সুতরাং সেটা বেঠিক হতে পারে না। এর ফলে ভাববাদীরাও বলতে পারেন, তাঁদের চিন্তাও বাস্তবের প্রতিফলন, সুতরাং সেটা সঠিক। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না বললে এরকম বিপত্তি ঘটতে পারে। আসলে মানুষের মস্তিষ্কের উন্নত গঠনের ফলে তার মধ্যে চিন্তা করার ক্ষমতা বা পাওয়ার অব ট্রানস্লেশন গড়ে উঠেছে। ফলে বস্তুজগৎ বা বহির্বিশ্ব যাই বলি না কেন তার সাথে মানুষের মস্তিষ্কের যে নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাত হচ্ছে, সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাতের চরিত্রের উপরই নির্ভর করছে কোনও মানুষের মনে কোন কোন ঘটনা কোন কোন ধারণার জন্ম দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়াতেই পারসেপশন বা ভাবের জন্ম হচ্ছে। এই পারসেপশন-ই আরও উন্নত হয়ে উন্নততর ভাব বা কনসেপশন-এর জন্ম দিয়েছে। তাই উপলব্ধি, ভাব, আদর্শ, চিন্তা, লজিক, সায়েন্স, ন্যায়-অন্যায় বোধ, মেথডলজি, চিন্তাপ্রক্রিয়া — সব ধারণাই এইভাবে গড়ে উঠেছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে পাভলভ যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন। তিনি বিষয়টাকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুন্দর ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিজে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হতে পেরেছেন কিনা সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু পাভলভ-এর পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের হাতে একটা মস্ত বড় অস্ত্র তুলে দিয়েছে। যে সমস্ত বিষয় আমরা এতদিন দর্শনের ভাষায় বলতাম, এখন সেই বিষয়গুলো আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি। যেমন ধরুন চেতনা। একে দু'ভাগে ভাগ করে আমরা বলতাম — প্রাণের চেতনা ও মনের চেতনা। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রে যে প্রাণের চেতনার অস্তিত্ব আমরা দেখি তাকেই আমরা বলতাম প্রবৃত্তি বা ইন্সটিংক্ট্। প্রাণের চেতনা বলতে আমরা প্রবৃত্তি বা ইন্সটিংক্ট্-কে বোঝাতে চাইতাম, তার স্নায়ুর ক্রিয়াকেই বোঝাতে চাইতাম। আর মনের চেতনা বা কনশাসনেস অব মাইন্ড-কে আমরা মানুষের মস্তিষ্কের পাওয়ার অব ট্রানস্লেশন বা চিন্তা করার ক্ষমতাকে বোঝাতাম। এটা হল উপলব্ধি থেকে চেতনা। এই চেতনার সাথে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। মানুষ এমন কিছু বিষয় চিন্তা করতে পারে যার সাহায্যে সে তার স্নায়ুকে কখনও স্টিমিউলেট (উত্তেজিত) বা কখনও ডিপ্রেস (অবদমিত) করতে পারে, পুরনো যে সমস্ত বিষয়গুলো তার মনের মণিকোঠায় জমানো ছিল সেগুলোকে সে নতুন করে স্মরণ করতে পারে।

আনকন্ডিশনড রিফ্লেক্স ও কন্ডিশনড রিফ্লেক্স

মস্তিষ্কের গঠন ও ক্রিয়া নিয়ে পাভলভ যে কাজ করেছেন এবং তা থেকে তিনি যেসব সত্য তুলে ধরেছেন, আমি এখানে তার কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক দিক তুলনার সাহায্যে সহজে বোঝবার মতো করে আপনাদের কাছে উল্লেখ করছি। আমরা জানি, মানুষের যে সেরিব্রাল করটেক্স্ সেটা অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে শুধু বড় তাই নয়, অনেক উন্নত, এনলার্জড অ্যান্ড ডেভেলপ্ড। অন্যান্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রে বহির্জগতের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন-এর প্রক্রিয়াটা ঘটে কী করে? আমরা জানি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফত বাইরের জগতের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — এগুলোর মারফত মস্তিষ্কের বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাথে বহির্জগতের প্রতিনিয়ত সংযোগ হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াতেই ইন্টারঅ্যাকশন ঘটছে। ফলে সেনসেশন বা সংবেদন হচ্ছে, ফার্স্ট সিগন্যাল সিস্টেম (প্রথম সংকেততন্ত্র) কাজ করছে, সঙ্গে সঙ্গে মোটর অ্যাকশন (পেশীর সঞ্চালন) হচ্ছে — অর্থাৎ ফ্রম সেনসেশন টু মোটর অ্যাকশন ঘটছে। সুতরাং সেনসেশন টু মোটর অ্যাকশন ইজ কন্ট্রোলড বাই দ্য ফার্স্ট সিগন্যালিং অ্যাকটিভিটি অর দ্য ফার্স্ট সিগন্যাল সিসটেম (সংবেদন থেকে পেশী-সঞ্চালন প্রক্রিয়া প্রথম সংকেত ক্রিয়া বা প্রথম সংকেততন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)। ট্রেনের লাইনে যেমন সিগন্যাল থাকে, কোন ট্রেন কোন লাইনে যাবে, কখন ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে যাবে, সেটা যেমন সিগন্যাল অনুযায়ী ঠিক হয়, এক্ষেত্রেও এই প্রথম সংকেততন্ত্রের সাহায্যেই ঠিক হয় কোন স্টিমিউলাস

(উত্তেজকের) কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে — অর্থাৎ, কোন ধরনের উত্তেজক বা সেনসেশনের জন্য কোন ধরনের মোটর অ্যাকশন বা প্রতিক্রিয়া ঘটবে। কুকুরটার কখন লালা ঝরবে, কখন লাফিয়ে পড়বে, বা কখন কোন ধরনের স্নায়ুর ক্রিয়া ঘটবে, এই বিষয়টা মস্তিষ্কের যে ক্রিয়ায় স্থির হয় তাকেই বলা হয় প্রথম সংকেততন্ত্র। অর্থাৎ, সিগন্যালিং (সংকেতটা) ঠিক করে কোন গ্ল্যান্ড (গ্রন্থি) বা নার্ভ (স্নায়ু) কাজ করবে, কোন অঙ্গটা কীভাবে কাজ করবে। কারণ সব ক্রিয়া আর সব সংবেদন বা সেন্সেশন তো একরকম নয়। খাবার দেখে কুকুরের যে সেন্সেশন হয় তাতে তার লালা ঝরতে থাকে, অর্থাৎ কতকগুলো গ্রন্থির উপর তার ক্রিয়া হয়। আবার লাঠি খেলে তার যে সেন্সেশন হয় তাতে সে হয়তো কুঁই কুঁই আওয়াজ করে। এর অর্থ হচ্ছে, আলাদা আলাদা সংবেদন আলাদা আলাদা ভাবে ক্রিয়া করে এবং তার ফলে তার প্রকাশ বা প্রতিক্রিয়াও আলাদা ধরনের হয়। পাভলভ রিফ্লেক্স্ অ্যাকশন বা পরাবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে এসব বিষয়কে বুঝিয়েছেন। মানুষ বা বহু জীবজন্তুর মস্তিষ্কে যে নার্ভ সেল (জীবকোষ) রয়েছে, তার যে ক্রিয়াকলাপ বা কার্যক্ষমতা তার ফলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফত যখন কোনও কিছু এসে মস্তিষ্কে বা স্পাইনাল কর্ড-এ (সুষুম্নাকাণ্ডে) ধাক্কা দেয় সঙ্গে সঙ্গে একটা সেন্সেশন, একটা প্রতিক্রিয়া, একটা ক্রিয়া ঘটে। এটাকেই বলা হয় রিফ্লেক্স্ অ্যাকশন বা পরাবর্ত ক্রিয়া। একথা ঠিক, মানুষের মস্তিষ্কই একমাত্র চিন্তা করতে পারে। কিন্তু সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যেই পরাবর্ত ক্রিয়া কাজ করে। নাহলে জীব ক্রিয়া করে কী করে? পাভলভ দেখিয়েছেন, রিফ্লেক্স্ বা পরাবর্ত দু'ধরনের আছে। একটা হল আনকন্ডিশনড রিফ্লেক্স (শর্তহীন পরাবর্ত), আর একটা কন্ডিশনড রিফ্লেক্স (শর্তাধীন পরাবর্ত)। এই দু'ধরনের পরাবর্ত বা রিফ্লেক্স্-ই জীবজগতে কাজ করে।

শর্তহীন পরাবর্ত বা আনকন্ডিশনড্ রিফ্লেক্স্ কাকে বলে? দু-একটি উদাহরণ দিলেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এর আগে যে বলা হল, কুকুরকে লাঠি দিয়ে মারলে সে হয়তো কুঁই কুঁই আওয়াজ করে, বা ঘেউ ঘেউ করে, বা মুখে খাবার দিলে তার লালা ঝরে — এসবই শর্তহীন পরাবর্তের উদাহরণ। আবার ধরুন, কোনও মানুষ ঘুমিয়ে আছে। সে ঘুমিয়ে আছে বলেই সেই সময় তার মনের সচেতন ক্রিয়াটা স্তিমিত থাকে। সেটা কোনও কাজ করতে পারে না। অথচ দেখা যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ যদি তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয় তখন সে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার পা সরিয়ে নেয়। সে টেরও পায় না যে, সে নিজেই নিজের পা সরিয়ে নিল। এটা কীসের ক্রিয়া? এটা স্নায়ুতন্ত্রেরই ক্রিয়া, অত্যন্ত স্বাভাবিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়াটা ঘটছে কীভাবে? না, তার শরীরে কিছু রিফ্লেক্স সেন্টার (পরাবর্ত কেন্দ্র) আছে, সেই পরাবর্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটছে। এগুলোকেই শর্তহীন পরাবর্ত বলা হয়। এখানে ভাবের কোনও ক্রিয়া নেই, সবটাই শারীরিক ক্রিয়া। একটা স্টিমিউলাস কাজ করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটছে।

আর শর্তাধীন পরাবর্ত বা কন্ডিশনড্ রিফ্লেক্স কাকে বলে? কোনও জন্তু যখন একটা পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায়, টিউনড্ হয় — তখনই তার মধ্যে শর্তাধীন পরাবর্তের ঘটনা ঘটতে পারে। নাহলে পারে না। এ ব্যাপারে পাভলভ নিজে যে কাজ করেছেন সেই অতি পরিচিত উদাহরণটাই আমি দিচ্ছি। পাভলভ একটা গৃহপালিত কুকুরকে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। কুকুরকে খাবার দেওয়ার সময় তিনি ঘণ্টা বাজাতে শুরু করলেন। একই সঙ্গে খাবার দেওয়া ও ঘন্টা বাজানোর সঙ্গে কুকুরটা অভ্যস্ত হয়ে পড়ল, অনেকটা টিউনড্ বা শর্তাধীন হয়ে পড়ল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে খাবার না দিয়েও শুধু যখন ঘণ্টা বাজানো হল তখন দেখা গেল, খাবার না দেওয়া সত্ত্বেও কুকুরটার লালা ঝরছে। এর আগে ঘণ্টার আওয়াজ এবং খাবার একসাথে যুক্ত হবার মধ্য দিয়ে সে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়েছে যে, শুধু ঘণ্টা বাজলেই তার লালা ঝরতে শুরু করে। এই ধরনের পরাবর্তকেই বলা হয় শর্তাধীন পরাবর্ত । কিন্তু পরপর বেশ কিছুদিন যদি খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজানো হয় তাহলে দেখবেন, কুকুরটির আর লালা ঝরছে না। সুতরাং শর্তাধীন পরাবর্ত ঘটে সেই কুকুর বা জন্তুর ক্ষেত্রে যে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের ভূমিকা

আবার ধরুন, গৃহপালিত কুকুর। কয়েক বছর বাদে দেখা হলেও মনে হয় যেন কুকুরটি মালিককে চিনতে পারে। দেখা যায়, কুকুরটি আগেও যেমন মালিককে দেখে লেজ নাড়ত, পায়ের ওপর শুয়ে পড়ত, বেশ কিছু দিন বাদে দেখার পরও সে মালিকের কাছে এসে সেইরকমই লেজ নাড়ে, পায়ে বা গায়ে শুয়ে পড়ে। এসব

দেখে অনেকেই মনে করেন, কুকুরটি মালিককে চিনতে পেরেছে। মনে করেন, কুকুরেরও তাহলে বুদ্ধি আছে। এখনও বহু লোকের এরকম ধারণা রয়েছে যে, কুকুর বা শিম্পাঞ্জি ঠিক মানুষের মতো চিন্তা করতে না পারলেও এদের বুদ্ধিশুদ্ধি বা ইনটেলিজেন্স্ আছে। ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নয়। কুকুরের চিনতে পারা, ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে খুঁজে বের করা, তার প্রভুভক্তি — এসবই হচ্ছে শর্তাধীন পরাবর্তের অত্যন্ত উন্নত ধরনের ক্রিয়া। এগুলো শর্তাধীন পরাবর্তের ডিগ্রির তারতম্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধির কোনও ক্রিয়া এখানে নেই। এই ধরনের বিষয় বা ঘটনাগুলো শর্তাধীন পরাবর্তের মধ্যেই পড়ে। মালিকের সাথে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার ফলে শুধু ঘ্রাণশক্তিই নয়, কুকুরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র একভাবে প্যাটার্নড্ বা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শর্তাবদ্ধ অবস্থার এই বাঁধা ধরন দীর্ঘকাল ধরে বজায় থেকেছে, স্টোরড্ বা সঞ্চিত হয়ে থেকেছে এবং দীর্ঘকাল পরেও একই উদ্দীপক বস্তু বা স্টিমিউলাস-এর ক্রিয়ায় শর্তাধীন পরাবর্তের রূপে তার প্রকাশ ঘটেছে। তাই বেশ কিছুদিন পর দেখা হলেও কুকুরের মধ্যে একই ধরনের সেনসেশন বা সংবেদন সৃষ্টি হয়। আর সেই কারণেই সে লেজ নাড়ে, পায়ে শুয়ে পড়ে। আর এটা দেখে অনেকেই ভুল করেন যে, কুকুরটি মালিককে চিনতে পেরেছে। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয় যে, কুকুরটি মালিককে চিন্তায়, মনে বা স্মৃতিতে ধরে রেখেছে। কুকুরের এই ক্রিয়াটা চিন্তা বা ভাবের ক্রিয়া নয়, এটা হল স্নায়ুতন্ত্রের শর্তাধীন পরাবর্তের ক্রিয়া।

যেমন ধরুন সাপ। সাপুড়েরা অনেকে ওষুধ হিসেবে শেকড় বিক্রি করে। আসলে সাপের ওরকম ওষুধ-টষুধ কিছু নেই। প্রথমত সাপ বিষাক্ত না হলে ছোবল মারলেও মানুষ নাও মরতে পারে। আবার বিষাক্ত সাপেরও যে সময় বিষ হয়, একমাত্র সে সময়ই ছোবল দিলে কেউ মরে যেতে পারেন যদি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা না হয়। বিষাক্ত সাপকে যখন প্রথম ধরা হয় তখন শেকড়ের মতো দেখতে লোহা গরম করে সাপুড়েরা সাপের মুখের সামনে ধরে। এইভাবে যে সাপ গরম লোহার শিকে ছোবল দিতে গিয়ে ছেঁকা খেয়েছে সেই সাপ শেকড় দেখলে মাথা গুটিয়ে নেয়। এটা কেন ঘটে? ঘটে শর্তাধীন পরাবর্তের জন্য। কিন্তু যে সাপ গরম লোহার শিকেতে কখনই ছোবল দেয়নি, সে শেকড় দেখলেও তেড়ে এসে আপনাকে মেরে দেবে। যাই হোক, এসবই হল শর্তাধীন পরাবর্তের উদাহরণ।

আমি একটু আগেই প্রথম সংকেততন্ত্র বা ফার্স্ট সিগন্যাল সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করে গেছি। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, আরও এক ধরনের সংকেত বা সিগন্যাল, অর্থাৎ দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র কাজ করে। সমস্ত জন্তুর মধ্যেই প্রথম সংকেততন্ত্র কাজ করে সেনসেশন টু মোটর অ্যাকশন-এর পথ ধরে। অর্থাৎ কোন সময়ে সেনসেশনটা কী রকম কাজ করবে সেটা সিগন্যালিং বা সংকেতের সাহায্যেই নির্ধারিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম সংকেততন্ত্র ছাড়াও যে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র আছে তার ক্রিয়ায় সেনসেশন টু পারসেপশন-এ এবং তারপর চলে যায় আরেকটা প্রক্রিয়ায়, তার নাম ট্রানস্লেশন। মস্তিষ্কের মধ্যেই সে ট্রানস্লেট করছে; অর্থাৎ ভাবছে, বিচার করছে, বিশ্লেষণ করছে। এসবই পরিচালিত হচ্ছে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের সাহায্যে। অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কের পাওয়ার অব ট্রানস্লেশন আছে বলে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে বলে সেনসেশন টু মোটর অ্যাকশনেই প্রক্রিয়াটা শেষ হয়ে যায় না। মূলত যেটা ঘটে, তাহল, সেনসেশন টু পারসেপশন টু কনসেপশন, যার প্রতিটি স্তরেই আবার মোটর অ্যাকশন ঘটতে পারে। আগেই বলেছি, পারসেপশন-ই আরও উন্নত হয়ে উন্নততর ভাব বা কনসেপশন-এর জন্ম দিয়েছে। এই পারসেপশনটা, কনসেপশনটা মস্তিষ্ক কোষ ধরে রাখতে পারে, স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে এবং আবার সেটা উল্টো দিকে, অর্থাৎ রেসিপ্রোকাল অ্যাকশন বা পারস্পরিক ক্রিয়ার সাহায্যে সেনসেশন ও মোটর অ্যাকশনের উপরও ক্রিয়া করতে পারে। এই প্রক্রিয়াগুলো সরল নয়, অত্যন্ত জটিল। যাই হোক, যখনই পারসেপশন এসে গেল, আইডিয়া বা ভাবের জন্ম হল, উপলব্ধির ব্যাপারটা এসে গেল — সেটাকে আমরা প্রকাশ করি কীভাবে? আমরা ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করি। ভাষা হচ্ছে চিন্তার বাহন। মানুষ যে কথা বলে, ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে ইংরেজিতে স্পিকিং পাওয়ার বা স্পিচ বলে। এটাও সে করে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের সাহায্যে। মানুষ ছাড়া দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র প্রাণীজগতের আর কারও মধ্যে কাজ করে না। বাস্তব পরিবেশের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এই দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র মানুষের মস্তিষ্কে চিন্তা এবং ভাব কী রকম হবে তার দিক্‌নির্দেশ করছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের ফলে যে ভাবগত প্রক্রিয়াটি মানুষের মধ্যে শুরু হয়ে গেল সেই চিন্তাশক্তিটা কীভাবে, কোনদিকে কাজ করবে সেটাই নির্ধারিত হয় এই দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের সিগন্যালিং-এর বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। যেমন ধরুন, আমাদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন-এর ঘটনা, বা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রক্রিয়া কাজ করে বলে কি একই

ঘটনায় আমি, আপনি, আর পাঁচজন একইরকম চিন্তা করি? না, করি না। দেখা যাবে, একই ঘটনায় একজন খুব রস উপভোগ করলেন, অথচ আর একজন সেই ঘটনাকে উল্টোভাবে বুঝলেন বা তার উল্টো ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মনে কোনও পূর্ব ধারণা বা জটিলতা কাজ করার ফলেই ট্রানস্লেশনের প্রক্রিয়াটা তাঁর মধ্যে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হল। এইভাবে মস্তিষ্কের যে কর্মপ্রণালী এবং ক্রিয়ার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চিন্তা বা ভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, যেটাকেই আমরা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা বা বিচারবিশ্লেষণের ক্রিয়া বলি, সেটা কন্ট্রোলড বাই সেকেন্ড সিগন্যাল সিস্টেম (দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)। মানুষ এভাবেই চিন্তা করার অধিকারী হয়েছে, বস্তুকে অনুধাবন করার, এমনকী নিজেকে অনুধাবন করারও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, যে ক্ষমতার অধিকারী অন্য কোনও জীবজন্তু হতে পারেনি।

পরিবর্তনের ধারায় পরিবেশের ভূমিকা

তাহলে ইতিহাস ও বিজ্ঞান থেকে আমরা পেলাম যে, বস্তুজগতের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই, প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই চেতনার অভ্যুত্থান হয়েছে। চেতনা ও বস্তুজগতের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রশ্নটি পৃথিবীতে মানুষ আসার পরে এসেছে। তখনই শুরু হয়েছে প্রকৃতি বা পরিবেশের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই পরিবেশ কথাটাকে অনেক সময় অতিসরলীকৃত ভাবে ভাবা হয়েছে। সেই কারণেই এই শিক্ষাশিবিরে প্রশ্ন এসেছে, একই পরিবেশে একই বাবা-মায়ের দুই ছেলে, দু'জনে দু'রকম হয় কী করে? একজন হয়ত হল সমাজবিরোধী, আর একজনকে হয়ত আমরা দেখলাম অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী বা নম্রই শুধু নয়, সে বিপ্লবী আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য কর্মী। তাহলে মার্কসবাদীরা যে পরিবেশের কথা বলে — বলে যে, পরিবেশের উপর সব কিছু নির্ভর করে, সে কথাটা কি ঠিক? এরকম একটা প্রশ্ন এখানে এসেছে। প্রশ্নটা এই কারণেই এসেছে যে, পরিবেশ সম্পর্কে এই যে ধারণা সেটা অতিসরলীকৃতভাবে ভাবা হয়েছে। মার্কসবাদীরা যখন বলে, পরিবেশ অনুযায়ী, বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের ভাবনা-চিন্তা, মানসিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে, তখন সেই পরিবেশের ধারণাটা অত্যন্ত ব্যাপক, সেটা এত সরলীকৃত নয়। মার্কসবাদে পরিবেশ বলতে তার মধ্যে মাইনিউটেস্ট ডিটেলস্-এ (অতি সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি) সমস্ত কিছুকেই ধরা হয়। যেমন ধরুন, বাবা-মা'রা ভাবেন, তাঁরা তাঁদের সমস্ত সন্তানকেই সমানভাবে ভালবাসেন। এই সমান কথাটার কোনও মানে নেই। বৈজ্ঞানিক বিচারে এই সমানভাবে ভালবাসা অসম্ভব, থিওরেটিক্যালি অ্যান্ড হিউম্যানলি ইমপসিব্‌ল, তত্ত্বগত দিক থেকে অসম্ভব এবং মানুষের সাধ্যের মধ্যেও অসম্ভব। একই ছেলের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বাবা-মা'র একইভাবে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়, বাবার ছেলের প্রতি বা ছেলের বাবার প্রতি মমত্ববোধও দু'বার একইরকমভাবে প্রকাশ পেতে পারে না এবং তার প্রতিক্রিয়াও এক হতে পারে না। এটা যদি আমরা স্বীকার করি এবং এই দুই ছেলে যে পরিবেশে বড় হচ্ছে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করি — অর্থাৎ এই দুই ছেলের বন্ধুবান্ধব, কাদের সঙ্গে কে মেশে, কে কাদের সঙ্গ দেয় সেইটে যদি বিচার করি — তাহলেই বুঝতে পারব, দু'জনের পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিরাজ করছে। শুধু তাই নয়, এই দুই ছেলের চিন্তাপদ্ধতি, মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, জীবনের সংগ্রাম, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে দু'জনের আচরণ, ব্যবহার বা দৃষ্টিভঙ্গি , এসব কিছু মিলেই বিরাট পার্থক্য ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং সাধারণত পরিবেশ বলতে সাধারণ মানুষ বা কমরেডরা যে ধারণা নিয়ে চলেন, পরিবেশ সংক্রান্ত ধারণাটা মোটেই সেরকম সংকীর্ণ নয়। অর্থাৎ পরিবেশ বলতে মার্কসবাদের ধারণা এরকম অতিসরলীকৃতভাবে বা মোটা অর্থে বুঝলে চলবে না। পরিবেশ ও ব্যক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে হাজার একটা দ্বন্দ্বের উপাদান আছে, এমনকী দ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। মার্কসবাদে এই সবকিছুকেই অতি সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ধরে বিচার করা হয়েছে। যে জিনিস আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না তাকেও বিবেচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত উপাদানই প্রতিমুহূর্তে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এভাবে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে, একই বাবা-মা'র দুটো ছেলে একেবারে বিপরীত চরিত্রের অধিকারী হয় কী করে।

আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাই, সেটা কি জন্মগত? এভাবে ভাবাটাও ঠিক নয়। একটা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা মস্তিষ্ক, বা তার একটা গুণমান প্রায় সমস্ত মানুষেরই আছে। কারও ক্ষেত্রে কোনও কারণে মস্তিষ্কের বিকলাঙ্গতা দেখা দিলে সেটা আলাদা কথা। সেটা তো ব্যতিক্রম। দুটো মানুষের মস্তিষ্কে একই ঘটনাকে ভিত্তি করে যখন দুটো বিপরীত ভাবনা গড়ে ওঠে, সেটা মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তার

ক্ষমতা বা সঠিকভাবে বললে পারিপার্শ্বিকের সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের পার্থক্যের ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নানা বিষয়ে ধারণা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিক কারণেই যে পার্থক্য ঘটতে পারে, সেই কারণে ঘটে। জন্মের পর থেকেই পরিবেশের পার্থক্য, শিক্ষা-দীক্ষার পার্থক্য, অভিজ্ঞতার পার্থক্য, প্রত্যেকের নিজের ভিতরের সংগ্রামের পার্থক্য ইত্যাদি কারণে ধীরে ধীরে যুক্তিবিচার, মনন, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য গড়ে ওঠে। তার ফলে একই ঘটনায় দু'জন মানুষের দু'রকম প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। অর্থাৎ একই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আলাদা হতে পারে। যার মস্তিষ্কে ঘাত-প্রতিঘাত বা ইন্টারঅ্যাকশন যেমন হচ্ছে, চিন্তার ফলও তেমন হচ্ছে। আসলে ঘাত-প্রতিঘাত নানারকম ঘটে বলে উপলব্ধিটাও নানারকমের হয়। কিন্তু উপলব্ধিটা নানারকমের হয় বলেই ঘটনাটাও নানারকমের, সেকথা সঠিক নয়।

এই যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ঘটে সে সম্পর্কে পার্টির উদাহরণ থেকেও আমরা শিখতে পারি। এ ব্যাপারে পার্টির অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে পারি। যেমন, পার্টির সমস্ত কমরেডই কি একরকম হয় নাকি? ধরুন, কিছু কমরেড একই নেতার অধীনে কাজ করে। অনেকে মনে করতে পারেন, এরা যখন একই পার্টিতে একই নেতার অধীনে একসঙ্গে কাজ করছে, সুতরাং তাদের পরিবেশটাও একইরকম। বিষয়টা মোটেই সে রকম নয়। পার্থক্য একটা ঘটছে এবং ঘটবেই। এক্ষেত্রে নেতাদেরও ভূমিকা আছে, কর্মীদেরও ভূমিকা আছে। যেমন আমরা কর্মীদের বলি, বাইরের পরিবেশ, কাজকর্ম সব কিছুরই প্রত্যেকের জীবনে একটা ভূমিকা আছে। যে পুঁজিবাদী সমাজে আমরা বাস করি, আমরা জানি, সেই পুঁজিবাদী সমাজের ময়লা প্রতিমুহূর্তে আমাদের মধ্যে জমছে এবং তার থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামের কথাও পার্টি সবসময় কর্মীদের বলছে। অর্থাৎ কর্মীদের প্রত্যেকের নিজস্ব যে সংগ্রাম যাকে আমরা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বলছি, তার উপর পার্টি সবসময়েই গুরুত্ব দেয়। এসব কথাগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু কমরেডরা কি তাদের মনের সমস্ত কাদামাটি ধুয়ে ফেলার সংগ্রাম প্রত্যেকে একইরকমভাবে পরিচালনা করতে পারছে? মনকে সকলেই উদার করতে পারছে? শুধু মুখেই ভালবাসার বক্তৃতা নয়, সমস্ত কমরেডদের বাস্তব অর্থে সকলেই যথার্থ ভালবাসতে পারছে কি? নেতারা পার্টিতে যে হাজার হাজার কর্মী আছে, এমনকী যাদের ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা ভালভাবেই চেনেন, সকলকেই কি নেতারা একইরকমভাবে ভালবাসেন? তাছাড়া নেতারা এমন করে কমরেডদের ভালবাসছেন কি, যেটা কমরেডদের ব্যক্তিগতভাবে সেই নেতার প্রতি 'নেওটা' করবে না? সেই কর্মীরাও কি নেতাদের এমনভাবে ভালবাসেন যেটা পার্টিকে ভালবাসার, পার্টি নেতৃত্বকে ভালবাসারই একটা ব্যক্তিরূপ মাত্র? নেতারা কর্মীদের এমনভাবে ভালবাসতে পারলেই তো কর্মীদের মনের মধ্যে যত সমস্যা সেগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। তা দলের প্রতি, আদর্শের প্রতি তখন এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে যখন সংসার বা পরিবারের শত সমস্যাও তাকে আটকে রাখতে পারে না। এমন করে ক'জন সংগঠক বা নেতা কর্মীদের ভালবাসতে পারেন ? এ ভালবাসার জাতই আলাদা। নাহলে ভেবে দেখুন, কর্মীরা যখন কোনও যোগাযোগের ভিত্তিতে দলের সাথে যুক্ত হয়, আদর্শের টানে দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো তাদের মনটা থাকে এক তাল মাটির মতো, কাদামাটির মতো। কৃষ্ণনগরের কুমোররা যেমন সেই নরম মাটি থেকে নানা পুতুল তৈরি করে, ছাঁচ দিয়ে নানা ধরনের ডিজাইন তৈরি করে, আমাদের বিপ্লবীদের কাজই হল শিল্পীর মতো, কুমোরের মতো সেই কাদামাটির মতো নরম মনগুলোকে ভালবাসার ছাঁচে ঢেলে প্রকৃত মানুষ করা, বিপ্লবী আন্দোলনের আগুনে তাদের মনের কাঠামোকে শক্ত করা।

অজৈব পদার্থ থেকেই জৈব পদার্থের সৃষ্টি

পরিবর্তন ও বিকাশ প্রসঙ্গে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আলোচনা করে যাওয়া দরকার। আমরা জানি, বস্তুজগৎ মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা এমন নয় যে, মানুষ আছে বলেই দুনিয়াটা আছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান থেকে এটাই আমরা পাই যে, পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেই বস্তুজগৎ অবস্থান করেছে। বস্তুজগতের বিকাশের এবং জীবজগতের বিবর্তনের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞানে সেটা স্বীকৃত। মানুষ আসার আগে প্রাণ এসেছে, প্রজাতির বিবর্তন ঘটেছে। আর তারও আগে আছে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ তৈরি হওয়ার ঘটনা। এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে, অজৈব জগত আর জৈব জগত, এ দুটো ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্ট নয়, অর্থাৎ পরস্পর সংযোগহীন সম্পূর্ণ আলাদা দুটো বিভাগ নয়। তাছাড়া যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র তাঁরা একথাও জানেন যে, ইনঅরগ্যানিক কম্পাউন্ড (অজৈব যৌগ) থেকেই

অরগ্যানিক কম্পাউন্ড (জৈব যৌগ) গড়ে উঠেছে এবং গোটা জীবজগৎ বা জীবদেহ সবই প্রধানত জৈব যৌগ দ্বারা গঠিত। আগে অনেকের ধারণা ছিল, অজৈব এবং জৈব পদার্থ আবহমান কাল ধরে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। সে ধারণা ঠিক নয়। আবার কিছু বৈজ্ঞানিক যে একদিন মনে করতেন পরীক্ষাগারে কোনও জৈবপদার্থ তৈরি করা সম্ভব নয়, সে ধারণাও বহুদিন আগেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষাগারে 'ইউরিয়া' তৈরি করার পর এই প্রশ্নে সংশয়ের আর কোনও অবকাশ নেই। আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ তৈরি করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, এরকম অসংখ্য জৈব পদার্থ তৈরি করা হচ্ছে অজৈব পদার্থ থেকে। কী করে প্রাণের সৃষ্টি হল, জীবনের সূচনা কী করে হল, কী কী উপাদান দিয়ে প্রাণের সৃষ্টি, প্রথম অরগ্যানিজম (প্রাণী) কী — এ ব্যাপারে বহু জিনিস বিজ্ঞান আজ জানতে পারলেও এখনও অনেক কিছু বিজ্ঞানের জানা বাকি আছে। আমি লক্ষ করেছি, ভাইরাস-এর অনেক কিছু এখনও জানা যায়নি। কিন্তু একটা বিষয় জানা গেছে, তাহল, ভাইরাস জৈব পদার্থ এবং অজৈব পদার্থ দুটোর মতোই ক্রিয়া করে। যখন সেটা জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে তখন সে অনেকটা জৈব পদার্থের মতোই ক্রিয়া করে। নাহলে অন্য পরিস্থিতিতে, যেমন কোনও শিশির মধ্যে রেখে দিলে তা আর জীবিত বস্তুর মতো আচরণ করে না, তখন সে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মতো একটা নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন, ভাইরাস-এর ইটিওলজি (ক্রিয়া নির্ণয় তত্ত্ব) জানতে পারলে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে।

ডারউইন আধুনিক জীবন বিজ্ঞানের পথিকৃৎ

জীবজগতের বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, প্রথম দিকে এ সম্পর্কিত ধারণাগুলো সবই ছিল অলীক অবাস্তব ধারণা, অর্থাৎ পৌরাণিক গল্পের মতো। ধর্মীয় পুস্তক বা ধর্মীয় চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই সেইসব ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল। এই চিন্তার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করলেন ডারউইন। তিনি দেখালেন, জীবজগতের বিকাশের একটা নিয়ম আছে, তার একটা ইতিহাস আছে। জীবজগতের এই পরিবর্তনগুলি খেয়ালখুশিমতো হয়নি। জীবজগতের বিকাশের ধারায় একেবারে জীববীজ বা প্রোটোপ্লাজম (প্রাণকোষের মূল উপাদান) থেকে শুরু করে অ্যামিবা (এককোষী প্রাণীবিশেষ) বা প্রোটোজোয়া (সরলতম এককোষী প্রাথমিক প্রাণীবর্গ) তৈরি হল, কিছু কিছু জিনিস হল জেলির মতো — এরা নিজেরাই নিজেদের বিভাজন করতে শুরু করল। এভাবেই তাদের বংশবৃদ্ধি শুরু হল। তখনও পুরুষ প্রাণী, স্ত্রী প্রাণী এবং তাদের মিলনের ফলে বংশবৃদ্ধির ঘটনা ঘটেনি। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের পথ বেয়ে নানা স্পেসিজ-এর (প্রজাতির) জন্ম হল। ডারউইন-এর ইভোলিউশন-এর (বিবর্তনবাদের) ধারণাটা এরকম ছিল যে, বানর জাতীয় একই গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বানর থেকে বনমানুষ ও পরবর্তীকালে বনমানুষ থেকে মানুষের আবির্ভাব হল। ডারউইন-এর তত্ত্ব একদিকে ভগবৎ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে, আধুনিক জীবনবিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে একথা যেমন সত্য, আবার একথাও সত্য যে, পরিবর্তনের যে দুটো রূপ আছে, অর্থাৎ যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন — এই জায়গাতে ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাজনিত কারণেই ডারউইন-এর চিন্তায় কিছু ফাঁক ছিল। ডারউইন শুধু ক্রমপরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু এই পরিবর্তনের ধারায় ধারাবাহিকতা এবং ছেদ, এই দুটোই যে অবস্থান করে এবং পরিমাণগত পরিবর্তন যে অবধারিতভাবে গুণগত পরিবর্তন ঘটায়, সেটা তিনি ধরতে পারেননি। এই দিক দিয়ে জীবজগতের বিবর্তনের পিছনে কারণ কী, বিবর্তন কেন ঘটছে, তার কারণটা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের জগতে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার ফলে ডারউইন-এর তত্ত্বকে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা সেসব কথা জানেন।

মনগড়া ধারণা সত্য বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না

তাহলে এই আলোচনা থেকে আমরা দেখছি, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে উপলব্ধির তারতম্য ঘটে। এই অবস্থায় আমরা সত্য বিচার করব কী করে? সকলেরই অধিকার আছে যার যার নিজের চিন্তাকে সঠিক বলে মনে করার এবং সেটা জোরের সাথে দাবি করার। কিন্তু জোরের সাথে দাবি করার দ্বারাই আমরা সত্যে উপনীত হতে পারি না। কারণ, কারও কিছু মনে করার উপর সত্য নির্ভর করে না। তাই বিচারে যেতে হয়, ক্রিয়া করতে হয়।

বেশিরভাগ ভাববাদী দর্শনেই এই ক্রিয়া করার ব্যাপার নেই। তাঁদের অনেকেই বলেন, দর্শনচর্চা জীবনের জন্য নয়, আত্মার তৃপ্তির জন্য। বিষয়টিকে আর একদিক থেকে বিচার করে দেখুন। আমরা সকলেই জানি, বুদ্ধ, যিশুখ্রিস্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য এঁরা সকলেই মনীষী, বড়মানুষ। সকলেই ধর্মপ্রচারক। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে এঁদের সকলের ধারণা এক নয়, একেক জনের একেক ধারণা। একজন সত্য বলে যা প্রচার করলেন, অপর একজন তাকেই খন্ডন করে ভিন্ন ধারণাকে সত্য বলে দাবি করলেন। তাহলে এঁদের মধ্যে কোন মনীষীকে মানুষ গ্রহণ করবে ? কে ঠিক, কে বেঠিক সেটা কী দিয়ে বুঝবে? আপনারা অনেকেই জানেন, স্কুলের মাস্টারমশাইরা শঙ্করাচার্য সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে তাঁকে ভগবান বলে অভিহিত করেন। তাঁর সম্পর্কে এমনও বলা হয়, তিনি নাকি খড়ম পায়ে গোদাবরী নদী হেঁটে পার হয়েছেন ! ফলে দর্শনের জগতে অতবড় যে একজন প্রতিভা, যিনি বেদান্ত দর্শনের স্রষ্টা, শ্রুতি-স্মৃতিকে মথিত করে একটা সিস্টেম অব ডিসিপ্লিন (সুসম্বদ্ধ তত্ত্ব) হিসেবে বেদান্ত দর্শনকে যিনি এদেশে নিয়ে এলেন তাঁকে বানিয়ে দেওয়া হল ভগবান। কেননা ভগবান না বললে চলবে না। প্রাচীনকালে ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে একটা বিষয় চালু ছিল। তর্ক করে একজন আর একজনকে হারিয়ে দিলে, যিনি হারিয়ে দিতেন তিনি বলতেন, আমাকে মেনে নিয়ে আর একজনকে বর্জন করল, এই আমার প্রতিষ্ঠা। সেদিন এইভাবেই একটা সত্যের পরিবর্তে আর একটা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্য কোথাও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরীক্ষা করার তাঁদের প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা তাঁরা চান না। তাই মার্কসবাদীরা জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটা মূল প্রশ্ন তুলেছে, তাহল ব্যক্তিধারণার উপর ভিত্তি করে নয়, পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সব কিছু বিচার করে দেখতে হবে।

এ ব্যাপারে কেউ বলতে পারেন, পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়েও তো আমরা ভুল করতে পারি। সে কথা ঠিক। তর্কবিতর্ক, আলোচনা, পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসার পরও ভুল হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মানুষ, তিনি যত বড় মানুষই হোন, তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা উপলব্ধির উপর নির্ভর করে চলতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, নাকি পরীক্ষানিরীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবিচারের উপর নির্ভর করে চললে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পরের পদ্ধতিকেই বলছে নির্ভরযোগ্য। কারণ এই পদ্ধতিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া এক্ষেত্রে যদি ভুলও হয়, ভুল সংশোধনের রাস্তাটাও জানা যাবে এই পদ্ধতিতেই, ব্যক্তির বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নয়। কিন্তু ব্যক্তি উপলব্ধির উপর নির্ভর করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আবার মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা ও যুক্তিবিচারের সাহায্যে যা উপলব্ধি করলাম তাও শাশ্বত নয়, তাও প্রতিনিয়ত বিচারসাপেক্ষ। কারণ সেই উপলব্ধিও ক্রিয়ার জন্য, শুধু ঘরে বসে আলোচনার জন্য নয়। আর ক্রিয়া করতে গেলেই অবশ্যম্ভাবীরূপে বাস্তবের সঙ্গে তার সংঘাত দেখা দিতে বাধ্য। সেই সংঘাতের মধ্যেই, যে উপলব্ধি হয়েছিল সেটা ঠিক কিনা তার পরীক্ষা হবে। আবার সেটাই শেষ পরীক্ষা, এমন ধারণাও ঠিক নয়। কিন্তু ভাববাদী দর্শনে সত্যের পরীক্ষা দিতে হয় না। তাই একটা মজার বিষয় সেখানে দেখবেন। সেখানে নানা মুনির নানা মত। ভাববাদীদের মধ্যে যাঁরা নিরীশ্বরবাদী তাঁদেরও সকলের ব্যাখ্যা একরকম নয়। নিছক ব্যক্তি উপলব্ধির উপর নির্ভর করে এইসব ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছে বলেই এরকম কাণ্ড ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞানে এরকম ব্যাপার ঘটে না। ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে তত্ত্ব ইংল্যান্ডে যা জাপানেও তাই, ভারতবর্ষেও সেটা একইরকম হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকমের তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত হতে পারে না। বিজ্ঞানের সত্য যেহেতু পরীক্ষালব্ধ সত্য, তাই বিজ্ঞানের যেকোনও বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিশেষ সিদ্ধান্ত ও সত্য একটাই। বিজ্ঞানে পরীক্ষালব্ধ সত্য কখনও ভুল প্রমাণিত হয় না। তবে পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন ক্ষেত্র বা ডোমেইন আবিষ্কৃত হলে, সেই নতুন ডোমেইন-এ নতুন সত্য বা নিয়ম কাজ করে, পুরনোটা সেখানে অকার্যকরী হয়ে যায়, যদিও পুরনো ডোমেইন-এ আগের মতোই তা একইভাবে কার্যকরী থাকে। কারণ সত্য সবসময়ই বিশেষ সত্য। এর বিরোধিতা করার অর্থ হল, বিজ্ঞানের মূল্যবোধ বা নৈতিকতারই বিরোধিতা করা। বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে যে দর্শন, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, তার ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

দুনিয়াকে শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, পাল্টানোই আসল কাজ

অন্যান্য দর্শনের সাথে মার্কসবাদের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, অন্যান্য দর্শন এতদিন দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করেই এসেছে, কিন্তু প্রয়োজন হল দুনিয়াকে পাল্টাবার। এই কথা থেকে কেউ যদি ধরে

নেন, মার্কসবাদীদের দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, শুধু পরিবর্তন করাই তাদের কাজ, তাহলে বলতে হবে, তাঁরা আসলে মূল বিষয়টা ধরতেই পারেননি। আবার উল্টোদিকে কেউ যদি মনে করেন, মাকর্সবাদ আসার আগে অন্য কোনও দর্শন দুনিয়ার পরিবর্তনে কোনও ভূমিকা পালন করেনি, সে কথাও ঠিক নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সঠিকভাবে অনুধাবন করলে এ ধরনের বিভ্রান্তির কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আসলে মার্কস এই কথার দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন ? বোঝাতে চেয়েছেন, দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি ডোমেইন বা ক্রিয়াকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিয়মগুলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যেভাবে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, যেটা দুনিয়াকে পাল্টাবার উপযোগী একটা সামগ্রিক ধারণার জন্ম দিয়েছে, অন্য কোনও দর্শনই সে কাজ করতে পারেনি। যেহেতু বহু ভাববাদী দর্শনই বিশ্বপ্রকৃতিকে এক অতিপ্রাকৃত সত্তার সৃষ্টি বলে প্রচার করে, তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের ভূমিকাকে তারা এভাবেই সীমাবদ্ধ করে দেখায় যে, মানুষ প্রকৃতির অধীন, সুতরাং সচেতনভাবে প্রকৃতির নিয়মের উপর ক্রিয়া করে নিজের প্রয়োজনে তাকে সে কাজে লাগাতে পারে না। এসব দর্শন সামাজিক বিধিব্যবস্থাকেও প্রধানত অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় মনে করেছে এবং মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, নিজের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য মানুষকে নিজেকেই এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যাতে তার সহনশীলতা বাড়ে এবং এগুলো মেনে নেওয়া যায়। পরিবর্তন বলতে তারা এরকমই বুঝিয়েছে। ফলে তাদের ভূমিকাও সেরকমই হয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই প্রথম দেখিয়েছে যে, প্রকৃতি ও সমাজের নিয়ম সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে প্রকৃতির উপর মানুষ সচেতনভাবে ক্রিয়া করে তার ক্ষতিকারক দিক যথাসম্ভব এড়িয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে এবং সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। সেই অর্থেই বলা হয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে দুনিয়াকে পরিবর্তন করা। অর্থাৎ সমাজবিকাশের ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণাটিকে ঠিকভাবে বুঝে প্রকৃতির নিয়ম ও সমাজের প্রয়োজনের স্বীকৃতি দিলে তবেই কথাটা দাঁড়ায়, এখন কাজ হচ্ছে দুনিয়াকে পরিবর্তন করা। এই অর্থেই মার্কসবাদ বলেছে, এই ‘জানা’ কথাটার কোনও মানে নেই যদি তার সাথে ‘ক্রিয়া’ কথাটা যুক্ত না থাকে। আমরা দুনিয়াকে পাল্টাতে চাই, নিজেদের পাল্টাতে চাই, পরিবর্তনের ধারায় মানুষ হিসেবে আমাদের সচেতন ভূমিকা আমরা পালন করতে চাই। সেজন্যই আমাদের জানার এত গরজ। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে চর্চা করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এখানেই। মানুষ আসার পর থেকে সে যদি তার মতো করে দুনিয়াকে জানবার ও সেই অনুযায়ী ক্রিয়া করার চেষ্টা না করত, তাহলে মানবসমাজ এক পাও এগোতে পারত না। আজ জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শনের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমরা যে আলোচনা করছি সে সুযোগও ঘটত না। এর মধ্য দিয়ে মানসিক যে আনন্দ আমরা পাই, সেই আনন্দও আমরা উপভোগ করতে পারতাম না।

আমরা সকলেই জানি, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, সংঘর্ষ করে যা সৃষ্টি করেছে তাকেই আমরা বলি প্রোডাকশন বা উৎপাদন। এই উৎপাদন দু’ধরনের। একটা হচ্ছে বস্তুগত উৎপাদন, আর একটা হচ্ছে ভাবগত উৎপাদন। দর্শন, চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, আদর্শ — এ সবই হল ভাবগত উৎপাদন। বস্তুগত উৎপাদনের তাগিদেই জন্ম হয়েছে ভাবগত উৎপাদনের। আবার এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে, পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বস্তুগত উৎপাদন হচ্ছে ভিত্তি। আমরা খেয়ে-পরে বাঁচতে চেয়েছি এবং সেইজন্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়তে চেয়েছি। এই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়তে গিয়ে প্রকৃতির সাথে যে সংগ্রাম আমাদের করতে হয়েছে, সেই সংগ্রাম আমাদের জীবনধারা বা উৎপাদনকে যেমন যেমন গড়ে তুলেছে তেমন তেমনই আমাদের গোটা ভাবগত উৎপাদনের পরিধিটা গড়ে উঠেছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনা আসার আগেই সমাজ অভ্যন্তরে মানুষের মনন বা মননশীলতার বিকাশের উপাদানগুলো সৃষ্টি হয় বা আগে থেকেই তৈরি হয়। এই কারণেই বুদ্ধ, যিশুখ্রিস্ট, মহম্মদ এঁরা সকলেই মনীষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের যুগে তাঁরা আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বকে আবিষ্কার করতে পারেননি। সেটা কি এই কারণে যে, আইনস্টাইনের প্রতিভা এঁদের সকলের চেয়ে বেশি ছিল ? এরকম কথা কেউ মানবে না। বিষয়টাকে বুঝতে হবে এইভাবে যে, এঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং বড় মানুষ। এঁদের যাঁর যাঁর যুগের সামাজিক পরিস্থিতি, বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই মূলত এঁদের প্রত্যেকের চিন্তাভাবনা, প্রত্যেকের বিচারশক্তি ও ইনটেলেক্ট (মেধা) গড়ে উঠেছে। যাঁর যাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, যেটা সেই সেই যুগের

শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, সেটাই তাঁদের চিন্তার সীমা বা লিমিট। আমি আবার বলছি, তাঁদের সামাজিক পরিস্থিতি, বাস্তব পরিস্থিতি যে যুগে যেটা বিরাজ করেছে সেটাই প্রধানত তাঁদের চিন্তাভাবনা-ধারণার সীমা নির্ধারণ করেছে। এটাই হল সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আর এই জায়গাটাতে অনেক বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকও গোলমাল করে ফেলেছেন।

মার্কসবাদ একটি বিকাশশীল দর্শন

মার্কসবাদের এই ব্যাখ্যাকে সঠিকভাবে বুঝলে বোঝা যাবে, মার্কস একশো বছর আগে যা বুঝেছিলেন সেই বোঝাটাও একশো বছর পরে মার্কসবাদীদের একরকম থাকে না বা থাকতে পারে না। থাকে না বলেই তার উপলব্ধি ও প্রকাশও পাল্টে যেতে বাধ্য। মার্কসবাদের যিনি স্রষ্টা, কার্ল মার্কস, মার্কসবাদের মূল কথাটা তিনি সেই বিশেষ যুগ ও সমাজের প্রেক্ষাপটেই বুঝেছিলেন, সেই বোঝাটা কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন পরিস্থিতিতে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। সেই বোঝাটা পাল্টায়, আরও সমৃদ্ধ হয়। আমি নিজে প্রথম দিকে মার্কসবাদ যা বুঝতাম, যেভাবে বুঝতাম সেই উপলব্ধিটা আজও একই স্তরে নেই এবং থাকতে পারে না। মার্কসবাদ বিজ্ঞান বলেই তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং উপলব্ধিকে নানাভাবে সুস্পষ্ট করে, সহজ ও স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করে আরও পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করা দরকার। আরও বিশ্বাসযোগ্য, ক্ষুরধার এবং অমোঘ করা দরকার। এর অর্থ মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করার নামে তাকে বিকৃত করা বা সমৃদ্ধ করার নাম করেই মার্কসবাদের মৌলিক যে সিদ্ধান্তগুলো সেগুলোকে পাল্টে দেওয়া বোঝায় না। দেশে দেশে সংশোধনবাদীরা আজ সেই ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমি সেকথা বলছি না, বলার প্রশ্নও আসে না। আমার বক্তব্য হল, মার্কসবাদের শিক্ষা অনুযায়ী আজ একশো বছর পরে মার্কসবাদের উপলব্ধিগুলো এক জায়গায় থাকতে পারে না। যেমন প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানা শাখাতে যেসব নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটছে এবং তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন নতুন যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলো গড়ে উঠছে সেগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য। তাই মার্কসীয় বিজ্ঞানের সর্বাত্মক বিকাশের প্রয়োজনে বিকাশের গতিপথে একেক সময়ে একেক ক্ষেত্রে তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গীমাও পাল্টে যেতে বাধ্য। এভাবে না বুঝলে মার্কসবাদের বিকাশ হতে পারে না। বিজ্ঞান বলেই এই ঘটনা ঘটে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। অন্যথায় মার্কসবাদের মৃত্যু অনিবার্য। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রতিনিয়ত আরও প্রাঞ্জল করে, স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার পথেই এগোতে হবে। না করতে পারলেই সেটা হবে একটা ডগ্‌মা। আমি আমার ভাষায় বললাম। দীর্ঘদিন আগেই লেনিন এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলস মার্কসবাদের মূল শিক্ষাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, দেশে দেশে মার্কসবাদীদের কাজ হল এই বিজ্ঞানকে সমস্ত দিকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করা।

চিন্তার আপেক্ষিক স্বাধীনতা

আমরা এর আগে বস্তু ও মনের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছি। বস্তুজগৎ যে প্রায়র — আর মন, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি যে বস্তুরই প্রোডাকট মাত্র সেসব আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে আমি আর একটি দিক সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। মন বলি, ভাব বলি, আদর্শ বলি, সমাজে যখন এর জন্ম হল, অর্থাৎ চিন্তাভাবনার উদয় হল, সেই চিন্তা আবার সমাজ ও বস্তুজগতকেও প্রভাবিত করে। অর্থাৎ বস্তুগত বুনিয়াদকে ভিত্তি করে যে চিন্তা বা ভাব গড়ে উঠল, সেই চিন্তা বা ভাবের জন্ম হওয়ার পর তার কিন্তু আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকে। সেই চিন্তা বা ভাবও সমাজ ও বস্তুজগতের সাথে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন ধরুন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরও এবং শিল্প ও কৃষি অর্থনীতি পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করা সত্ত্বেও আজও চিন্তার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ভাবনাধারণার ক্ষেত্রে, আচারআচরণ-অভ্যাসের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের হ্যাংওভার (রেশ) কাজ করে। ভিত-এ পুঁজিবাদ এলেও চিন্তাজগতে বা উপরিকাঠামোতে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা যে রয়ে গেছে সেটা সম্ভব হল এই কারণেই যে, চিন্তাভাবনা, আদর্শের আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে। নাহলে এটা সম্ভব হত না। আজকের যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ পাল্টা আদর্শগত আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়েই একমাত্র ঐ পুরনো বস্তাপচা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার যে রেশ সমাজে রয়ে গেছে সেটাকে পরাস্ত করা সম্ভব।

তাহলে যাকে বলা হয় আইডিয়লজি বা মতাদর্শ, অর্থাৎ যেকোনও বিষয় সম্বন্ধে সিস্টেমেটিক ভিউজ (সুসম্বদ্ধ চিন্তা), তার ভূমিকা অসামান্য। বলাবাহুল্য, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোনও মতাদর্শ শ্রেণীআদর্শ বা শ্রেণীচিন্তা হতে বাধ্য। কোন আদর্শ সঠিক, কোন আদর্শ বেঠিক তার উপর নির্ভর করবে সমাজের অগ্রগতির আন্দোলনে কোন আদর্শ কী ভূমিকা পালন করতে পারবে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত সংগ্রামের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয় তার কারণ এইখানেই নিহিত। সেই দলই বিপ্লবের জমি তৈরি করার ক্ষেত্রে, বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে যথাযথ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম যে দলের মতাদর্শ সঠিক, যে দল আদর্শগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এই আদর্শগত সঠিকতার উপর গড়ে ওঠে সাংগঠনিক বুনিয়াদ, অর্থাৎ সঠিক মতাদর্শকে যথাযথ সাংগঠনিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতা। বলাবাহুল্য, এই বিষয়টি নির্ভর করে তত্ত্ব এবং ক্রিয়ার যথাযথ দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ের উপর।

জ্ঞানতত্ত্বের আরও বহু জিনিস আছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া অব প্র্যাকটিস, অর্থাৎ প্রয়োগ বা পরীক্ষা। প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'রকম পরীক্ষাই আছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরীক্ষাপদ্ধতি একরকম, আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানে পরীক্ষাপদ্ধতি ভিন্নরকম। বিজ্ঞানের এইসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির দরকার হয়। নানা ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতেকলমে পরীক্ষা করতে হয়। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সবকিছুই পরীক্ষাসাপেক্ষ হওয়া দরকার। তা না হলে সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যায় না। মার্কসবাদেও এই প্রয়োগ বা পরীক্ষার বিষয়টি অপরিহার্য, কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানে ল্যাবরেটরিতে যে ধরনের পরীক্ষা হয় এটাও সেই ধরনের পরীক্ষা, একথা মনে করবেন না। মার্কসবাদে যে ক্রিয়ার কথাটা এসেছে, অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্বকেই যে ক্রিয়ার সাহায্যে যাচাই করতে হয়, সেই তত্ত্ব ও ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণাটা আমাদের পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া দরকার।

থিওরি ও প্র্যাকটিস বিচ্ছিন্ন নয়

স্ট্যালিন বলেছেন, "থিওরি উইদাউট প্র্যাকটিস ইজ স্টেরাইল, প্র্যাকটিস উইদাউট থিওরি ইজ ব্লাইন্ড' (ক্রিয়াহীন তত্ত্ব বন্ধ্যা, তত্ত্বহীন ক্রিয়া অন্ধ)। অর্থাৎ, এরকম তত্ত্ব কোনও কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং মানুষের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে না। এরকম তত্ত্ব সৃজনশীল এবং ক্রিয়াধর্মী নয় বলেই সেটা বন্ধ্যা। তার দ্বারা কোনও কাজ হয় না। তেমনই যে ক্রিয়ার সঙ্গে তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক নেই সেই ক্রিয়া অন্ধ। এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলতে পারেন, কেন আমি তো কাজ করছি, পোস্টার মারছি, চাষীর ঘরে যাচ্ছি, মানুষের সাথে মিশছি, কথা বলছি, তাদের সাথে প্রতিদিন কাটাচ্ছি, স্লোগান দিচ্ছি — তার মানেই তো আমি ক্রিয়ার মধ্যে আছি, আমি প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার অধিকারী। যাঁরা এইভাবে ভাবেন সেই সমস্ত কমরেডদেরও আমি সতর্ক করে দিতে চাই। আমি বলতে চাই, যদি তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁরা এই প্রয়োগগুলো না করে থাকেন, সংগ্রামগুলো না করে থাকেন, এই সমস্ত কাজগুলো তত্ত্বসম্মত কিনা সেটা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্পর্কের মধ্যে খেয়াল না করে থাকেন, তাহলে তাঁদের ভাবতে হবে, সেই অভিজ্ঞতার মূল্য কতটুকু? আর তা না হলে এসব হল প্রকৃতিজগতের আর পাঁচটা অন্ধ ক্রিয়ার মতোই একটা ক্রিয়া মাত্র। ধরুন, কোনও চাষী যিনি চাষ করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তিনি যদি মনে করেন, তিনি যেহেতু চাষী, কাজেই চাষীর জীবনের মূল সমস্যা মার্কস, লেনিন, বা মাও-এর চেয়েও তিনি বেশি বোঝেন, তাহলে সেই কথাটার কোনও মানে দাঁড়ায় না। এই কারণে দাঁড়ায় না যে, দুনিয়ার এই সমস্ত অসাধারণ প্রতিভাশালী কমিউনিস্ট নেতা যে তত্ত্বের চর্চা করেছেন সেটা বাস্তবে প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সেটা বাস্তব থেকে বিচ্যুত নয়। বিষয়টাকে এভাবে বোঝা দরকার। আমাদের চাষী কর্মীদেরও একথা বুঝতে হবে যে, তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্য নিশ্চয়ই আছে, সেটা অস্বীকার করার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু চাষী আন্দোলনকে অন্ধতা থেকে মুক্ত করে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালনার জন্য মার্কসবাদের মূল শিক্ষাগুলো তাঁদের ভাল করে আয়ত্ত করতে হবে এবং জীবনভর মার্কসবাদী তত্ত্বের চর্চা ও জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে হবে।

আবার একথাও ঠিক, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন বা মাও, এঁদের সকলকেই চাষীদের কাছ থেকে শিখতে হয়েছে। সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই অনেক কিছু শেখার আছে। এদিকটার প্রতি এঁরা সকলেই খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। এর একটা আর একটা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এ দুটোরই সমন্বয় অর্থাৎ মিলন ঘটানো দরকার। আবার বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে যদি এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়

যেটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, পুরনো ধারণার কিছু পরিবর্তন দরকার, পাল্টানো দরকার, তখন সেই ধারণাকে পাল্টাতে হতেই পারে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এর ভুরি ভুরি নজির আছে।

সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ প্র্যাকটিস একই হিউম্যান প্র্যাকটিসের দুটো দিক

বিজ্ঞানের জগতেও আমরা দেখতে পাই, বিজ্ঞানের নানা গবেষণার সাহায্যে যেমন আমরা বহু মূল্যবান ও মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি, বিজ্ঞানের সেই তত্ত্বগুলোকে তেমনই আবার প্রতিমুহূর্তেই প্রয়োগ করার প্রশ্নও থাকছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানেও কাজের সুবিধার জন্য থিওরেটিক্যাল সায়েন্স (বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিক) এবং অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স (ফলিত বিজ্ঞান), দু'ভাগে ভাগ করে আলাদা করে চর্চা করা হলেও দুটো বিচ্ছিন্ন নয়। মার্কসবাদ চর্চা করার ক্ষেত্রেও কথাটা একইভাবে প্রযোজ্য। এখানেও ব্যাপারটা এরকম নয় যে, একদল শুধু তত্ত্বের চর্চা করবে, আর একদল শুধু এলাকায় কাজ করবে। যাঁরা এলাকায় কাজ করেন, ফিল্ড ওয়ার্ক করেন তাঁদেরও প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখতে হবে — অন্ধের মতো নয়, — তত্ত্বটা ঠিক কিনা এবং তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা সাহায্য করছেন কিনা। আবার যাঁরা তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান, তত্ত্বের চর্চা করেন তাঁদেরও লক্ষ রাখতে হবে, তাঁরা যে তত্ত্বের চর্চা করছেন সেটা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পথ দেখাতে, অর্থাৎ গাইডিং প্রিন্সিপল্ হিসেবে বাস্তবে কাজ করছে কিনা। যদি না করে তাহলে বুঝতে হবে, শুধু সময় ও শক্তির অপব্যয় হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তেই এ দুটোর সমন্বয় ঘটাতে হবে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, যেটাকে প্র্যাকটিক্যাল মুভমেন্ট (ব্যবহারিক ক্রিয়া) বলছি তার সাথে তত্ত্বকে সচেতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রতি মুহূর্তে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি তত্ত্বকে বলতে চাই সাবজেকটিভ প্র্যাকটিস, আর যাকে আমরা সাধারণত ক্রিয়া বা প্র্যাকটিস বলি তাকে বলতে চাই অবজেকটিভ প্র্যাকটিস। অর্থাৎ সাবজেকটিভ প্র্যাকটিস এবং অবজেকটিভ প্র্যাকটিস দুটো মিলেই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সামগ্রিক ক্রিয়ার ক্যাটিগরি বা পরিধি। সাবজেকটিভ প্র্যাকটিস অর্থাৎ তত্ত্ব, এবং অবজেকটিভ প্র্যাকটিস অর্থাৎ ক্রিয়া — এই দুটোর কর্মধারা ভিন্ন হলেও দুটোই হচ্ছে হিউম্যান প্র্যাকটিস। এভাবে না বুঝলে কিন্তু বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাঁরা তত্ত্ব ও ক্রিয়াকে যান্ত্রিকভাবে বোঝেন তাঁদের অনেক সময় বলতে শুনি, আপনারা তত্ত্বগতভাবে সঠিক, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হচ্ছে না। তাঁরা বলতে চান, এস ইউ সি আই তত্ত্বের দিক থেকে ঠিক, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঠিক নয়। তাঁদের এই যুক্তি মেনে নিলে বলতে হয়, অন্যেরা তত্ত্বের দিক থেকে ভুল, কিন্তু ওঁদের প্রয়োগটা ঠিক! এধরনের যুক্তি তাঁরাই করতে পারেন যাঁদের মার্কসবাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রেই গলদ আছে, অর্থাৎ যাঁরা মার্কসবাদের নামে অন্য কিছু চর্চা করেন। কেননা যে তত্ত্ব সংগ্রাম, পরীক্ষানিরীক্ষা, বা ক্রিয়ার ফল নয় সেটা তত্ত্বগতভাবে সঠিক হয় কী করে ? সেটা হতে পারে না। তত্ত্বগতভাবে সঠিক মানেই হল প্রয়োগ করতে গিয়ে একেবারে উল্টোপাল্টা জিনিস হয় না। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকরা তত্ত্বগতভাবে সঠিক এমন তত্ত্বকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় তদ্রূপ বা অ্যাপ্রক্সিমেশন-এর কথা বলেন, অর্থাৎ সেখানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটু-আধটু পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু একেবারে ওলটপালট হতে পারে না, অবশ্য যদি অন্যান্য কারণ বা পরিস্থিতি আলাদা না হয়। সেকারণেই বলছিলাম, তত্ত্ব সঠিক, প্রয়োগ ভুল — এরকম হয় না। এই কারণেই হয় না, যেহেতু সেই সঠিক তত্ত্বটা অবজেকটিভ প্র্যাকটিসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এ কথা বলার পরও আমি লক্ষ করেছি, অনেক সময়ে কিছু কমরেডের মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন দেখা যায়। তাঁরা বলেন, আমাদের তত্ত্বটা ঠিক, এটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও গণ্ডগোল না থাকলে আমরা কাজটা ঠিকমতো করতে পারছি না কেন, আমাদের আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না কেন? আসলে তাঁরাও যেন বলতে চাইছেন, আমাদের প্রয়োগটা ভুল। তাঁদের বুঝতে হবে, একথাটার কোনও মানে নেই। আসলে তত্ত্বকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমস্ত কর্মীদের যেভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা দরকার সেই জায়গায় ঘাটতি আছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়। এজন্যই স্ট্যালিন বলেছিলেন, রাজনৈতিক লাইন সঠিক হলেই চলবে না, দেখতে হবে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সেই রাজনৈতিক লাইনকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না। যে বিরুদ্ধ শক্তি বা পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে তাকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি বলেই তেমন সফলতা অর্জন বা আশানুরূপ অগ্রগতি আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই নাও ঘটতে পারে। আবার তাই বলে আমরা বিরুদ্ধ

পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এটা কোনও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। আমাদের সবসময় বিচার করে দেখতে হবে, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক তাকে মোকাবিলা করার জন্য একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে সংগঠনের সামনে যে সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। সেখানে চেষ্টার কোনও ত্রুটি যাতে না থাকে সেটা প্রতিমুহূর্তে ভাল করে দেখা, নজর দেওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে যেন কোনও ফাঁক না থাকে। আমাদের ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব যদি বিরুদ্ধ পরিবেশের উপরেই আমরা চাপিয়ে দিই, সেই মানসিকতাই যদি আমাদের গ্রাস করে, তাহলে এপথে আসাটাই আমাদের উচিত হয়নি। প্রতিটি দেশের সফল বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই আমরা পাই যে, বহু ব্যর্থতা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লড়াই করতে করতেই, তাকে মোকাবিলা করতে করতেই একদিন সেসব দেশে বিপ্লব সফল হয়েছে।

মার্কসীয় দর্শনের উদ্ভবের ইতিহাস

এখন, মার্কসবাদী দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে হেগেল এবং ফুয়েরবাকের চিন্তা ঐতিহাসিকভাবে মার্কসের চিন্তা বা দর্শন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও কিছুটা আলোচনা করে যেতে চাই। হেগেলই ডায়ালেকটিক্যাল ল, বা দ্বন্দ্বতত্ত্বের আবিষ্কর্তা বলতে পারেন। বস্তুজগতই শুধু নয়, সমাজ ও জীবনের সবকিছুই যে দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিনটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, হেগেলই প্রথম দর্শনের জগতে তা বিশ্লেষণ করে দেখালেন। এই যে কসমিক ইভলিউশন (মহাজাগতিক বিবর্তন) যেখানে প্রতিটি বস্তু বা ঘটনাই কামিং ইনটু বিয়িং অ্যান্ড গোয়িং আউট অব বিয়িং (অস্তিত্বে আসছে এবং অস্তিত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে), সে সব কিছুই হেগেল তাঁর মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত বিষয়টাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তা থেকে দাঁড়াচ্ছে, এই বস্তুজগৎ বা যা কিছু আমরা দেখছি সে সবই হচ্ছে অ্যাবসোলিউট আইডিয়ার দ্বান্দ্বিক প্রকাশ। অর্থাৎ যা কিছু আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় মারফত জানছি — এই যে অবজেকটিভ রিয়েলিটি (বাস্তব জগৎ), বা ধরুন মানবসমাজ — হেগেল বলতে চাইলেন, এ সব কিছুই হল অ্যাবসোলিউট আইডিয়ার দ্বান্দ্বিক প্রকাশ। হেগেল তাঁর চিন্তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একথাও বলেছেন, "অল দ্যাট ইজ রিয়েল ইজ র‍্যাশনাল" (যা কিছু বাস্তব তাই যুক্তিসম্মত)। হেগেলের এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্ন উঠল। প্রশ্ন হল, যা বাস্তব তাই যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে চৌর্যবৃত্তিকেও যুক্তিযুক্ত বলতে হয়। বলতে হয়, চুরি করাটাও হচ্ছে অ্যাবসোলিউট আইডিয়ার দ্বান্দ্বিক প্রকাশ। আর তাই যদি হয়, তাহলে তো চোরকে শাস্তি দেওয়া চলে না। হেগেল বললেন, এসব আমার বিরুদ্ধে কুযুক্তি। কিন্তু হেগেল একথা বললে কী হবে? তাঁর বক্তব্যের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত হিসাবে ওটা এসে যেতে বাধ্য।* তাছাড়া অ্যাবসোলিউট আইডিয়ার প্রবক্তা হিসেবে তিনি প্রুশিয়ান অ্যাবসোলিউট রাষ্ট্রের সমর্থক হলেন। ডায়ালেকটিসিয়ান (দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক) হওয়া সত্ত্বেও অ্যাবসোলিউট আইডিয়ার সমর্থক হলেন। হেগেলের এই যে অ্যাবসোলিউট

---

* "All that is real is rational, and all that is rational is real" — এখানে real বলতে হেগেল সেটাকেই বুঝিয়েছেন, "which at the same time is necessary" এবং "in the course of development all that was previously real becomes unreal, loses its necessity, its right to existence, its rationality, a new visible reality takes the place of moribund reality"। হেগেলীয় দর্শনের এই দ্বান্দ্বিক বিচারধারা দেখিয়েই এঙ্গেলস এই দর্শনের "true significance and revolutionary character"এর উল্লেখ করেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বিষয়টি আলোচনা করেছেন অন্য দিক থেকে। তিনি বলেছেন, সবকিছুর পরিবর্তন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঘটে — এই দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতির আবিষ্কর্তা হেগেল হলেও এবং এই কথা বলা সত্ত্বেও বস্তু ও ভাবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বস্তুই যে প্রায়র, এটা ধরতে না পারার ফলেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সত্ত্বেও তাঁর দর্শনে বিপত্তি দেখা দিচ্ছে। এর ফলে "হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস হয়ে পড়ল ডায়ালেকটিকস অব আইডিয়া", অর্থাৎ হেগেলের ভাষায় দাঁড়াল ভাব আগে, বস্তু পরে, ভাব থেকেই বস্তুর জন্ম এবং absolute idea থেকে বস্তুজগতের সৃষ্টি। হেগেলীয় দর্শন অনুসারে এটাই দাঁড়ায় যে, original idea থেকে যে জগৎসংসারের সৃষ্টি সেখানে সমস্ত কিছুই real। কারণ সবকিছুই absolute idea-র dialectical expression-এর necessity হিসাবেই সৃষ্টি হচ্ছে এবং এজন্যই তা rational। কাজেই সেখানে যা real তা সবসময়ই real, সেখানে চুরিও real। অর্থাৎ absolute idea-কে ভিত্তি করে বিচার করলে হেগেলীয় দর্শন অনুসারেই হেগেলীয় dialectics কাজ করতে পারে না। কারণ তাঁর দর্শনের কাঠামো, আর তাঁর dialectical বিচারপদ্ধতি পরস্পরবিরোধী। কমরেড ঘোষ এই জিনিসটাই দেখাতে চেয়েছেন। এঙ্গেলস হেগেলীয় dialectical বিচারপদ্ধতিকে যে অর্থে revolutionary বলেছেন তাকে কোনওভাবেই contradict করেননি।

আইডিয়ার ধারণা সেটা অনেকটা আমাদের দেশের বেদান্তের মতো। বেদান্তের সাথে পার্থক্য এইখানে যে, হেগেল যেহেতু দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধারণা নিয়ে এসেছেন তাই তাঁর বক্তব্য থেকে বস্তুজগৎ যে পরিবর্তনশীল সেটা বোঝা যায়। কিন্তু বেদান্তের 'ব্রহ্ম' হচ্ছেন নির্গুণ, নিরাকার — তিনি শান্ত, সমাহিত হয়ে বসে আছেন, তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। কী করে যে বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটছে এসব বিষয়গুলো শুধু বেদান্ত দর্শনই নয়, সাংখ্য বা অন্য কিছুর মধ্যেই পরিষ্কার নয়। কিন্তু হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বে সে ত্রুটি নেই। থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এ সব কিছুর মধ্য দিয়েই পরিবর্তন ঘটছে, এ সব কিছুই হেগেলের বক্তব্যে আছে।

যাই হোক, হেগেলের অনেক ছাত্র হেগেলের এই ধরনের বক্তব্যকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের বলা হত লেফ্ট্ হেগেলিয়ান। ফুয়েরবাকও হেগেলের ছাত্র ছিলেন, তিনিও হেগেলের যুক্তিকে মেনে নিতে পারলেন না। ফুয়েরবাক বললেন, সমস্ত গণ্ডগোলের মূল কারণ হচ্ছে ঐ অ্যাবসোলিউট আইডিয়া। এই অ্যাবসোলিউট আইডিয়ার দরকার কী? এই অ্যাবসোলিউট আইডিয়া তো প্রমাণিত নয়। ফলে তা মেনে নেব কেন? অ্যাবসোলিউট আইডিয়া বলে কিছু নেই। এই প্রকৃতি, বস্তুজগৎ এগুলোই হল বাস্তব সত্য। ফুয়েরবাক এটা সঠিকভাবেই বললেন। কিন্তু ভাব, যার অস্তিত্ব আছে সেটা কী, কোথা থেকে এবং কীভাবে এল, এর কোনও ব্যাখ্যা ফুয়েরবাক দিতে পারলেন না। আসলে বস্তু ও ভাবের সম্পর্ক কী সেই সঠিক ধারণা হেগেলেরও ছিল না, ফুয়েরবাকেরও ছিল না। বস্তুজগৎই যে আসল, ফুয়েরবাক তা মানলেন। কিন্তু মানুষের সামনে ন্যায়-অন্যায়, মূল্যবোধ, আদর্শ, এসব তো রয়েছে। এসবের সৃষ্টি বা পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে? এক্ষেত্রে ফুয়েরবাক এক ধরনের শাশ্বত মৌলিক মানবিক গুণাবলীর কথা বললেন। অর্থাৎ তিনি অপরিবর্তনীয় মানবতাবাদের কথা বললেন। তাই পরবর্তীকালে ফুয়েরবাকের স্থান ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে মানবতাবাদী দার্শনিক হিসাবে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী হিসাবে নয়। মার্কস ও এঙ্গেলস যেমন ফুয়েরবাকের চিন্তাকে বস্তুবাদী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং প্রশংসাও করেছেন, কিন্তু নীতিনৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রশ্নে ফুয়েরবাক যে সে জায়গাটা ধরে রাখতে পারেননি সেটাও পরিষ্কারভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং যথার্থভাবেই তাঁর চিন্তার সমালোচনা করেছেন। এখানে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার। তা হচ্ছে, মানবতাবাদী মতাদর্শ প্রচারে ফুয়েরবাকের এত অবদান সত্ত্বেও রুশো, ভলতেয়ার, শেক্সপীয়ার, গ্যেটের কারেন্টের লোক ফুয়েরবাক ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ও আমি বলে যেতে চাই। অনেকের ধারণা, মানবতাবাদ এবং রেনেসাঁসের গোটা যুগটাকেই যান্ত্রিক বস্তুবাদ পরিচালনা করেছে। যে বস্তুবাদীরা চিন্তার উপর প্রাধান্য দেন না, ভাবের আপেক্ষিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন না, আমরা জানি, তাঁরাই মেকানিক্যাল মেটিরিয়ালিস্ট (যান্ত্রিক বস্তুবাদী)। আমি বলতে চাই, শুধু যান্ত্রিক বস্তুবাদই নয়, তার সাথে অ্যাগনস্টিসিজম (অজ্ঞেয়বাদও) রেনেসাঁসের যুগে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অজ্ঞেয়বাদী যাঁরা, তাঁরা অবজেকটিভ ল-এর (বাস্তব নিয়মের) ভিত্তিতেই কাজ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁরা বস্তুবাদের কিছুটা কাছাকাছি চলে এসেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক কী সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা হেগেলেরও ছিল না, ফুয়েরবাকেরও ছিল না। কার্ল মার্কসই ভাব ও বস্তুর পরস্পর সম্পর্ক কী সেটা সর্বপ্রথম সঠিকভাবে দেখালেন। তিনি শুধু একথা বলেই শেষ করেননি যে, বস্তু ও ভাব এদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। তিনি দেখালেন, ভাব হচ্ছে বস্তুর বিশেষ ক্রিয়ার ফল। বস্তুই যে মনের স্রষ্টা, সেকথা তিনিই সর্বপ্রথম এবং সঠিকভাবে দেখালেন এবং সেভাবেই মার্কসবাদকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করালেন। তাহলে দেখা গেল, হেগেল দ্বন্দ্বতত্ত্বের চর্চা করেও ভাবকে বস্তুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, অ্যাবসোলিউট ভাবই বস্তুর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু মার্কস বললেন, বস্তুই ভাবের জন্ম দিয়েছে। তাই হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদের এবং মার্কসের দ্বন্দ্বতত্ত্ব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের জন্ম দিয়েছে।

ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি

কিন্তু মার্কসবাদ গড়ে ওঠার পরও ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নে, বা আনুষঙ্গিক বেশ কিছু ব্যাপারে মার্কসবাদী মহলে বা মার্কসবাদী বলে পরিচিত মহলে বেশ বিভ্রান্তি দেখা গেছে। এ সম্পর্কে কয়েকজনের কথা বলব। যেমন, আমাদের দেশে এম এন রায় শুরু করেছিলেন মার্কসবাদী হিসাবেই, যদিও

তিনি শেষপর্যন্ত মার্কসবাদী থাকতে পারেননি, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হয়ে পড়লেন। সেযুগে ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কর্সবাদের ব্যাপক তত্ত্বমূলক আলোচনা কেউ যদি করে থাকেন, সেটা করেছেন এম এন রায়। এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে এম এন রায়ের চিন্তাগত ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে যে ত্রুটি আমার নজরে পড়েছে, সেগুলো কিছু কিছু পয়েন্ট আকারে বলে যাচ্ছি। প্রথমত, এম এন রায় মনে করতেন, মানুষ র‍্যাশনালিটি (বিচারবুদ্ধি) নিয়ে জন্মেছে, অর্থাৎ, ম্যান ইজ অরিজিন্যালি র‍্যাশনাল (মানুষ গোড়া থেকেই বিচারবুদ্ধির অধিকারী)। এভাবে চিন্তা করার মধ্য দিয়ে বস্তু থেকে ভাবের উৎপত্তি এবং বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সম্পর্ককে অস্বীকার করার মাধ্যমে তিনি আসলে বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করেছেন। দার্শনিকদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা এ ধরনের মতে বিশ্বাসী। আমি তাঁদের সাথে একমত হতে পারিনি। কারণ, মানুষের মধ্যে যে ভাবের সৃষ্টি হল, সেটা কীভাবে হল? আমরা জানি, বস্তুজগত মানুষের মস্তিষ্কের সাথে প্রতিনিয়ত সংস্পর্শে আসছে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফত এবং এর ফলে মানুষের মস্তিষ্কে যে ঘাত-প্রতিঘাত ঘটছে, ইন্টারঅ্যাকশনের যে প্রক্রিয়া কাজ করছে, তার ফলেই ভাবের সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, মানুষ ভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং মানুষ বিচারবুদ্ধি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে, একথা বলার পরিষ্কার ভাবার্থ হচ্ছে যে, মানুষ যখন জন্মায় তখনই সে একটা ভাব নিয়ে জন্মায়। অথচ মানুষ গোড়া থেকেই বিচারবুদ্ধির অধিকারী এভাবে যদি বলা হয়, তাহলে ভাবনাচিন্তা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার করা হয়। আমি জানি, এম এন রায় ছাড়াও কিছু কিছু মার্কসবাদী দার্শনিক আছেন যাঁরা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এভাবে ভাবলে ভাববাদের বীজটা থেকেই যায়। তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, তিনি বলতে চেয়েছেন, মার্কসবাদ আসলে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এটা বাস্তবে ঠিক নয়। মার্কসবাদ যে জ্ঞানজগতের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করেই একটি দর্শন বলে প্রমাণিত, সেই সত্যকে তিনি এ ধরনের চিন্তার দ্বারা অস্বীকার করেছেন। তৃতীয়ত, উনি ভাবের উপর জোর দিয়েছেন এমনভাবে যাতে প্রাইমেসি অব ম্যাটার (বস্তুর প্রাধান্যকে) অস্বীকার করা হয়। আসলে এই তিনটি দিকের কথা আমি যা বললাম, ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত মানবতাবাদী দার্শনিকের চিন্তার ধাঁচাটাই এইরকম। ফুয়েরবাকও শেষপর্যন্ত এর বাইরে যেতে পারেননি। বরঞ্চ এম এন রায়ের চিন্তার মধ্যে ফুয়েরবাকের চিন্তার প্রতিফলন আমরা মূলত দেখতে পাই। এম এন রায় রাজনৈতিক জীবনে কমিউনিস্ট হিসাবে শুরু করলেও, এমনকী বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে কিছুদিন ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামকে এড়িয়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি দেখা দিল। আর এটাই হল, এম এন রায়-এর বিপত্তির মূল কারণ। তিনি নিজেকে এক জায়গায় ধরে রাখতে পারলেন না। কমিউনিস্ট হিসাবে শুরু করলেও এক সময়ে তিনি বললেন, আমার মতপার্থক্য রয়েছে। তাকে ভিত্তি করে লিখলেন, 'আওয়ার ডিফারেন্স' বইখানা। তারপরেই বললেন, কমিউনিজম একটা ডগমা। বললেন, আমি মার্কসিস্ট নই, মার্কসিয়ান। শেষপর্যন্ত হয়ে পড়লেন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট।

ক্রিস্টোফার কডওয়েল, যাঁর বিজ্ঞানের উপর ভাল দখল এবং যিনি মার্কসবাদী আন্দোলনেরই লোক, তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রেও কিছু ত্রুটি আমার নজরে পড়েছে। যদিও এম এন রায় ও তাঁর অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু দু'জনের কাছেই আমরা ঋণী। কডওয়েল বিজ্ঞানের উপর 'দ্য ক্রাইসিস ইন ফিজিক্স' নামে একটা বই লিখলেন, কিন্তু সেই বইতে দেখা গেল, মার্কসবাদের প্রতি সমর্থন থাকলেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কজালিটি ও ডিটারমিনিজম-এর পারস্পরিক সম্পর্কের উপলব্ধিতে তাঁর ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু কডওয়েল তাঁর বিভিন্ন লেখায় বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সম্পর্কে সুন্দর বিশ্লেষণ রেখে গেছেন, যদিও তাঁর সমস্ত বিশ্লেষণের সাথে আমি একমত হতে পারিনি। তবু কডওয়েল-এর জীবনসংগ্রামটা খুবই শিক্ষণীয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তিনি প্রাণ হারালেন। এইসব ঘটনা দুনিয়ার কমিউনিস্টদের অনেক প্রেরণা জুগিয়েছে।

জাঁ পল সার্ত্রে সম্পর্কে আমি আলোচনার শুরুতেই কিছু কথা বলে গেছি। তিনি শুরু করেছিলেন মানবতাবাদী হিসাবেই। তিনি শুরু থেকেই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন শুধু নয়, তিনি একসময় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে একমাত্র সঠিক দর্শন হিসাবে মনে করতেন। আবার একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, কমিউনিজম একটা ডগমা। খ্রিস্টধর্ম যেমন একটা ডগমা, কমিউনিজমও সেই ধরনের আর একটি ডগমা। আগেই বলেছি, সার্ত্রের মতে ঈশ্বর নেই। এখন, যেহেতু ঈশ্বর আছেন এ ভিত্তিতেই একসময় নৈতিক মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়, পাপপুণ্য

ইত্যাদি নির্ধারিত হত, সেক্ষেত্রে ঈশ্বর নেই মানে কোনও প্রায়রি ভ্যালু (ধর্মীয় মূল্যবোধ) নেই, ইউনিভার্সাল মরাল ক্যাটিগরি বা সর্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধের ক্যাটিগরি বলতে কিছু নেই। তাই সার্ত্রের মতে সকলের নৈতিক মূল্যবোধ কী হবে, সেকথা বলার মানে হল ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। তিনি বললেন, ম্যান হ্যাজ টু চুজ হিজ ওন ভ্যালুজ (মানুষকে নিজের মূল্যবোধ নিজেকে বেছে নিতে হবে)। অবশ্য এর দায়দায়িত্বও তার নিজের ওপরে বর্তাবে। আর যেহেতু মানুষ কী বেছে নেবে, না নেবে, সেটা একান্তই তার নিজের ব্যাপার, সে অর্থে এক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা হবে অ্যাবসোলিউট। আবার যেহেতু বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে কিছু না কিছু বাছতেই হবে, তাই আর এক দিক থেকে দেখলে স্বাধীনতা তার কাছে এ কাইন্ড অব কনডেমনেশন (একপ্রকার শাস্তি)। একটি সুন্দর কথার মধ্য দিয়ে সার্ত্রে তাঁর এই ভাবকে ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, "ম্যান, এভরি ইনডিভিজুয়াল, ইজ কনডেমড টু ফ্রিডম" (স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মানুষ, প্রতিটি ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত)। ভাষার ব্যঞ্জনাটা লক্ষ করুন!

সমাজের মুক্তি ও বিকাশের মধ্যেই যে ব্যক্তির মুক্তি ও বিকাশের পথটি নিহিত রয়েছে, সেভাবে সার্ত্রে দেখেননি। ব্যক্তির মুক্তিটাই তাঁর কাছে আসল। সেজন্য তিনি লড়েছেন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির মুক্তি অর্জন যে অসম্ভব, এ জায়গা থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু লড়াইয়ের প্রশ্ন যখনই দেখা দিয়েছে, তিনি কখনই পিছপা হননি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তিনি মরণপণ যোদ্ধা ছিলেন, ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনেও তিনি লড়েছেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। অন্যদিকে সার্ত্রের বক্তব্য ছিল, ধর্মযাজকরা, মানবতাবাদীরা বা কমিউনিস্টরা সকলেই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করছে। তিনি ধরতেই পারেননি যে, তাঁর এসব চিন্তাও সামাজিক চিন্তাভাবনা ও তাঁর ব্যক্তিসত্তার সংঘাতেরই ফল, একটা বাইপ্রোডাকট। এর ফলে যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করতে চাইছেন সেই সংগ্রামটাই মার খাবে। বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে ধরতে না পারায় এবং বুর্জোয়া ও প্রোলেটারিয়েটের শ্রেণীসংগ্রামে নিজের শ্রেণীগত অবস্থান ঠিক করতে না পারায় তিনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই তিনি না হিউম্যানিস্ট, না কমিউনিস্ট — তিনি এগজিসটেন্সিয়ালিস্ট (অস্তিত্ববাদী)। সার্ত্রের মতো রাসেল সম্পর্কেও গোড়ায় দু'একটি কথা বলেছি। এ ব্যাপারে আরও কিছু কথা বলা দরকার বলে মনে করছি। রাসেল জীবনের শেষ দিকে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এমনকী একসময় যিনি ছিলেন কট্টর মার্কসবাদবিরোধী, পরবর্তী জীবনে তিনিই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই, পরমাণু যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সাম্যবাদী শিবির ও বিশ্বজনগণের মুক্তি আন্দোলনের বেশ কিছুটা কাছের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তবুও দর্শনচিন্তার দিক থেকে তিনি রয়ে গেলেন তাঁরই স্বীকৃতি অনুযায়ী একজন অ্যানালিটিক এমপিরিসিস্ট, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হতে পারলেন না।

মার্কসবাদ নিজেই একটা বিজ্ঞান

আলোচনার শুরুতেই আমি দেখিয়েছি, মন আগে না বস্তু আগে, এই প্রশ্নে দর্শনজগতে দীর্ঘদিন ধরে যে তর্ক ছিল সেসব তর্কের মীমাংসা অনেক আগেই হয়ে গেছে। মন যে বস্তুরই প্রোডাকট মাত্র এবং দুনিয়াতে বস্তুবহির্ভূত বা বস্তুনিরপেক্ষ কোনও সত্তার যে অস্তিত্ব নেই, সেসব আলোচনা মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই করা হয়েছে। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভালভাবে বুঝতে হলে আরও বহুদিক আছে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার বা প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। এর কিছু কিছু দিক আমি অন্যান্য শিক্ষাশিবিরেও এর আগে আলোচনা করেছি। তবুও আমি মনে করি, সে সমস্ত বিষয়গুলো নতুন করে আলোচনা করা দরকার। যাঁরা পার্টির সাথে নতুন যুক্ত হয়েছেন তাঁদের জন্য তো বটেই, এমন কী পুরনোদের জন্যও দরকার। মার্কসবাদই একমাত্র দর্শন যে বিজ্ঞানের মর্যাদা দাবি করতে পারে। সে শুধু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) নয়, সে নিজেই একটি বিজ্ঞান। কী ধরনের বিজ্ঞান? সাধারণ অর্থে আমরা বিজ্ঞান কাকে বলি? রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান — এগুলোকে সাধারণত বিজ্ঞান বলা হয়। বস্তুর যে বিভিন্ন ধর্ম বা গুণাবলী সেসবই পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বিশদভাবে বোঝবার জন্য বস্তুজগতের বিভিন্ন দিক ও গুণাবলীকে আনুষ্ঠানিকভাবে কতকগুলো ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করার জন্য, বোঝবার ও কাজের সুবিধার জন্যই এই বিভক্তি করা হয়েছে। এখন

প্রশ্ন হচ্ছে, রসায়ন শাস্ত্রের কাজ কী? বস্তুর রাসায়নিক গুণাবলী বা এলিমেন্ট (মৌল) ও তাদের কম্পাউন্ডগুলির (যৌগগুলির) বিক্রিয়া, কোন সূত্রগুলির দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার যে কাজ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে বিভাগ সেটা করে তাকেই রসায়নশাস্ত্র বলা হয়। একইভাবে পদার্থবিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই বিভাগ যা বস্তুর ফিজিক্যাল প্রপার্টি (ভৌত গুণাবলী), বস্তুর বিভিন্ন রূপ, তাদের ইন্টারঅ্যাকশন এবং পরিবর্তনের নিয়মকে, অর্থাৎ যে নিয়মের দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় তাকে অধ্যয়ন করে। অঙ্কশাস্ত্রও তাই। অঙ্কশাস্ত্র কী ধরনের বিজ্ঞান, এটা অনেকেই ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন না। আমি একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করছি। যেমন রসায়ন শাস্ত্রে সাধারণত ৯২টি মৌল ধরা হয় — এগুলো হল রাসায়নিক উপাদান। সমস্ত পদার্থ এইসব রাসায়নিক মৌল দিয়েই গঠিত এবং তাদের রাসায়নিক গঠন এই মৌলগুলি দিয়েই প্রকাশ করা হয়। তেমনি অঙ্কে যে সংখ্যার চর্চা করা হয়, সমস্ত সংখ্যাকেই সাধারণত ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,০ এই দশটি সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। সেই অর্থে এই দশটি সংখ্যা হল অঙ্কশাস্ত্রের উপাদান। এই সংখ্যাগুলিকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে পরপর বসিয়ে সমস্ত সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয়। আবার বিভিন্ন সংখ্যাকে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ — এই চারটি মূল প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেললে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ফল পাই। এই যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, এগুলো হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার প্রক্রিয়া। মনে রাখতে হবে, উৎপাদনকে ভিত্তি করে দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর ব্যবহার করতে গিয়েই, বস্তুর বিভিন্ন পরিমাপ করার প্রয়োজন থেকে অ্যাবস্ট্রাকশন-এর (বিমূর্তকরণের) মাধ্যমে সংখ্যার ধারণার জন্ম হয়েছে এবং এর থেকেই অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, অঙ্কশাস্ত্রেরও একটা বস্তুভিত্তি আছে। আপনারা এও জানেন, পাটিগণিত ছাড়াও অঙ্কশাস্ত্রে বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ডিফারেন্সিয়াল (ব্যাসগণিত), ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস (সমাকলন) এবং আরও অনেক কিছু আছে। অঙ্কশাস্ত্রের এই সমস্ত প্রক্রিয়াই একেক ধরনের বিশ্লেষণ, অথবা জেনারেলাইজেশন (সাধারণীকরণ)। যুক্তিশাস্ত্রের আরোহ ও অবরোহকে, অর্থাৎ বিশেষ থেকে সাধারণ এবং সাধারণ থেকে বিশেষকে ভিত্তি করেই এসব গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যেমন বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রের গঠন হয়েছে, অঙ্কশাস্ত্রের সমস্ত সূত্রগুলোও তেমনি বিশেষ থেকে সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বস্তুর বিভিন্ন ধর্ম অনুসন্ধান করে, বিশ্লেষণ করে সেসবের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়, যার থেকে আমরা বস্তু সম্পর্কিত ধারণাগুলি পাই। এই বস্তু সম্পর্কিত সাধারণ সত্যগুলো নির্ণয় করার প্রয়োজনে অঙ্কশাস্ত্রের সূত্রগুলো ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ভাবনাধারণার ব্যবহার করতে হয়। তাই বলছি যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র, প্রক্রিয়া বা ভাবনাধারণার এই যে ব্যবহার, এটা বস্তুজগতের অবজেকটিভ অর্ডার (সুবিন্যস্ত অবস্থান) বা সেই অর্থে বস্তুর ম্যাথমেটিক্যাল ফিচার (গাণিতিক বৈশিষ্ট্য) বা সাধারণ শৃঙ্খলাবদ্ধতাকেই নির্দেশ করছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বস্তুনির্বিশেষে বিমূর্তকরণের প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ করা, তাদের পরিচালনার নিয়মগুলোকে পর্যবেক্ষণ করাই হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্রের কাজ। সেইজন্যই অঙ্কশাস্ত্রও একটি বিজ্ঞান যা উৎপাদনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিকাশের সাথে সাথে বিকাশলাভ করেছে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে, মস্তিষ্কে বস্তুজগতের ইন্টারঅ্যাকশনকে কেন্দ্র করে বিশেষ মনন প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ ইন অ্যাবস্ট্রাকশন জেনারেলাইজ (বিমূর্তভাবে সাধারণ ধারণা গঠন) করে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে ফর্মাল লজিককে অনুসরণ করে অঙ্কশাস্ত্রের যে বিভিন্ন ধারণা ও সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়েছে, সেগুলোকে যদি কনভার্সলি (বিপরীতক্রমে) বস্তুজগতে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিটি বিশেষ সিদ্ধান্ত বস্তুসত্যের সাথে নাও মিলতে পারে। অঙ্কশাস্ত্র বস্তুভিত্তি থেকেই গড়ে উঠেছে একথা যেমন সত্য, আবার তার মানে এ নয় যে, দুনিয়াটা অঙ্কশাস্ত্র অনুসরণ করে চলে। বরং অঙ্কশাস্ত্রের কাজ হল, বস্তুসত্যকে সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করা, বস্তুজগতের শৃঙ্খলাবদ্ধতার বাস্তবানুগ পরিচয় দেওয়া।

ঠিক একইভাবে জীববিজ্ঞানও বিজ্ঞানের একটা বিভাগ। আর তাছাড়া আজকাল তো সমাজবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্রকেও বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোস্যাল সায়েন্স, ইকনমিকস, এসবগুলোকে আমাদের দেশে আর্টস সাবজেক্ট হিসাবে ধরা হয়, যদিও আধুনিক দুনিয়ায় এসব বিষয়কে অনেক দেশই বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে গণ্য করে। আমাদের দেশে ইকনমিকসকে সায়েন্স হিসাবে গণ্য করার

কথা হচ্ছে, যদিও মানসিকতার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। এসব বিষয়গুলো কী অনুসন্ধান করে? প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিশেষ ঘটনাগুলো ঘটে, সেই ঘটনাগুলো যে বিশেষ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেই নিয়মগুলোকে, কার্যকারণ সম্পর্ককে অনুসন্ধান করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। এই যে বিশেষ বিশেষ নিয়মের আওতায় বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী ঘটছে সেই সমস্ত বিশেষ নিয়মকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা, বস্তুজগতের ধারণা, একটা সিস্টেম অব ডিসিপ্লিন (সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা) হিসাবে একটা মালার মতো গাঁথা হয়ে আছে।

বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে, বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হল, এরা কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত? কোন মূল নীতি বা সাধারণ নিয়মের দ্বারা তারা সম্পর্কযুক্ত? স্বাভাবিক কারণেই এই প্রশ্নও উত্থাপিত হল, যে সাধারণ নিয়ম বা মূল নীতির দ্বারা এরা সম্পর্কযুক্ত, এমন কোনও বিজ্ঞান আছে কি যে বিজ্ঞান সেই সাধারণ নিয়ম বা মূল নীতিগুলোকে অনুসন্ধান করে? পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তারা এর উত্তরে বলল, না। তাদের যেটা আছে সেটা হল মেটাফিজিক্স বা জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র, অর্থাৎ বিজ্ঞানের উপর খবরদারি করার ব্যাপার। সুতরাং তাদের হাতে মেটাফিজিক্স আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগগুলো কীভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত তাকে জানবার, বোঝবার যে বিজ্ঞান সেটা তাদের হাতে নেই। শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তির জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করল, যাকে আমরা শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব বলি, সেই লড়াই শুরু হওয়ার ঐতিহাসিক স্তরেই এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছবার পরই বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার বিশেষ সত্যগুলোকে সাধারণীকরণ করার মধ্য দিয়ে এই বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে। সেই বিজ্ঞান হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। ইট ইজ দ্যাট সায়েন্স হুইচ স্টাডিজ দ্য জেনারেল ল'স হুইচ গভার্ন অ্যান্ড ইন্টাররিলেট দ্য পার্টিকুলার ল'স রিভিলড বাই দি অ্যাকটিভিটিজ অব পার্টিকুলার ব্রাঞ্চেস অব সায়েন্স। সো মার্কসিজম ইজ এ ফুল-ফ্লেজেড অর কমপ্রিহেনসিভ সায়েন্স। (এ হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যা সেই সাধারণ নিয়মগুলির অনুসন্ধান করে, যেগুলি বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে মার্কসবাদ হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপক বিজ্ঞান।) তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষাগুলোকে মার্কসবাদ এড়িয়ে যেতে পারে না। তার উপর কোনও মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া বা অস্বীকার করা বা তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই মার্কসবাদের। তাই মার্কসবাদ একমাত্র দর্শন যেটা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। আবার সে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করছে, অগ্রগতিকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ মানবসমাজের হাতে এই প্রথম বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলোকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রক্রিয়ায় ইনটিগ্রেট (সংযোজিত) করেছে।

মার্কসবাদ মানবমুক্তির দর্শন

একথাও আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে যে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মার্কসবাদ আসার পিছনে কাজ করেছে। সাধারণত এই অর্থেই মার্কসবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বলা হয়। কিন্তু কেউ যদি মার্কসবাদকে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থেই শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বলে মনে করেন, তাহলে ভীষণ ভুল হবে। এরকম মনে করলে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দেবে। কেন একথা বলছি? যেদিন দুনিয়াতে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটবে, রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে — মার্কসবাদকে প্রচলিত অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বললে এ প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য যে, তাহলে কি সেদিন মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কোনও কার্যকারিতা থাকবে না? আমার আপত্তি এখানেই। কেননা সেদিনও বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসাবে মার্কসবাদের কার্যকারিতা থাকবে। তাই প্রচলিত অর্থে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বলতে আমার আপত্তি আছে। মার্কসবাদকে একটা চিন্তাপদ্ধতি, বিচারপদ্ধতি হিসাবে বোঝা দরকার। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীআকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করছে বলেই মার্কসবাদকে শ্রেণীদর্শন বলা হয়। আর একথাও তো সত্য যে, ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও মানবমুক্তির স্বার্থ আজ এক এবং অভিন্ন হয়ে গেছে, মার্কসবাদ সেই কারণেই মানবমুক্তিরও দর্শন।

বস্তু সম্পর্কিত কিছু দার্শনিক বিভ্রান্তি

আপনারা দেখবেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় একটি প্রশ্ন বার বার ঘুরে ফিরে দেখা দেয়। তা হচ্ছে, এই যে বস্তুজগৎ আমরা দেখছি, বস্তুময় এই যে জগৎ, সেই বস্তুর আদি কী? অর্থাৎ বস্তুর গোড়া কী? আমার ধারণা, এই প্রশ্ন ভবিষ্যতেও বার বার ঘুরে ফিরে আসবে নানা কারণে। আপনারা সকলেই জানেন, একটা সময় ছিল যখন বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে, অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম বস্তু কী সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে দেখা গেল রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করলে এরকম তত্ত্বই দাঁড় করাতে হয় যে, অ্যাটম হল সেই ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা যা অবিভাজ্যরূপে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। তাহলে দাঁড়াল, পদার্থমাত্রই অ্যাটম দিয়ে গঠিত। বস্তু কীভাবে গঠিত সেই প্রশ্ন বিচারের এই পর্যায়ে এসে একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হল, দেখা গেল অ্যাটমকে আর ভাঙা যাচ্ছে না। সুতরাং ধারণা হল, অ্যাটমই ক্ষুদ্রতম এবং আদি বস্তুকণা। অনেকেই বলতে শুরু করলেন, অ্যাটম অবিভাজ্য বা অভঙ্গুর, যেহেতু অ্যাটমকে ভাঙা যাচ্ছে না। সুতরাং তাঁরা বললেন, অ্যাটমই হল শুরু — অ্যাটমই মূল, যার সাহায্যে গোটা বিশ্বদুনিয়া গড়ে উঠেছে। তাঁরা ধরে নিলেন, অ্যাটমই আদি সত্তা। সেদিন অ্যাটমকে অপরিবর্তনীয় একটা শাশ্বত সত্তা হিসাবে ভাবা হয়েছে এবং ভাববাদী দার্শনিকরা অ্যাটমকে ভাঙতে না পারার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের শাশ্বত বা অ্যাবসোলিউট ধারণার সমর্থন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি সেখানে থেমে থাকেনি। আজ স্কুলের ছাত্ররাও জানে যে, অ্যাটম ভেঙে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বহু বস্তুকণা পাওয়া গেছে। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, আরও কত কী। বলা বাহুল্য, এর ফলে ভাববাদী দর্শন ভীষণ একটা ধাক্কা খেল। এরপর আধুনিক বিজ্ঞানে ফান্ডামেন্টাল পার্টিক্‌ল্‌-এর (মৌলিক বস্তুকণার) যে ধারণা সেটাকে বিসর্জন দিতে হয়। তার পরিবর্তে যে কোনও সূক্ষ্ম বস্তুকণাকে কম্পোজিট অব সো মেনি ডায়নামিক অ্যান্ড মাইনিউট পার্টিক্‌ল্‌স (গতিশীল ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বহু বস্তুকণার সমাহার) হিসাবে ভাবা হয়। এই বস্তুকণাগুলি পরস্পর ইন্টারন্যালি টাস্‌ল্‌ (নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ) করছে, তার ফলে মোশন (গতি) হচ্ছে। এই সবকিছু মিলেই বস্তু গতিশীল হচ্ছে। এই যে পরমাণুর মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা, যেগুলো বহু ক্ষেত্রে পরস্পর রূপান্তরযোগ্য, এগুলো আবিষ্কারের পর এটা অস্বীকার করা চলে না যে, মৌলিক বস্তুকণা বলে কিছু নেই। যত সূক্ষ্মই হোক, বস্তুকণা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি অব সাম আদার মাইনিউট পার্টিক্‌ল্‌স (অন্য কতগুলো বস্তুকণার সন্নিবেশ)। কোনও একটা বস্তুকণার স্ট্রাকচার (গঠন) যদি ধরা হয়, তাহলে তার মধ্যে অসংখ্য গতিশীল বস্তুকণার অবস্থান দেখতে পাওয়া যাবে। এইভাবে বস্তুকণার ভাঙনের শেষ নেই, অর্থাৎ বস্তুকণা থেকে বস্তুকণা তৈরির প্রক্রিয়ারও শেষ নেই। আমাদের বুঝতে হবে, একটা বিশেষ বস্তুর শুরু আছে, বিশেষ বস্তুর শেষ আছে। কিন্তু কোনও নির্বিশেষ শুরু বা সব কিছুর এক জায়গায় শেষ, এসব ধারণা বিজ্ঞানে আজ চলতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে ইলেকট্রন বা সাব-অ্যাটমিক বস্তুকণার রূপ ও চরিত্র সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যে আলোচনার মধ্যে আমি এখনই ঢুকছি না। সেসব বিষয় আমি পরে আলোচনা করব।

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করে যেতে চাই। আমরা জানি, বস্তু গতিশীল। বস্তুর এই গতির কারণ কী বা গতির উৎস কী — এ সম্পর্কে নিউটনের সময় ধারণা ছিল এরকম যে, কজ অব্ মোশন ইজ এক্সটারন্যাল (গতির কারণ বাইরে নিহিত)। সে সময়ে বিজ্ঞানের যতটা অগ্রগতি ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে নিউটন এভাবে দেখেছেন যে, একটা ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া হল, যত জোরে ছোঁড়া হল সেই অনুপাতে দূরে গিয়ে ঢিলটা পড়ল। তাহলে এই যে ঢিলটা ততদূরে গিয়ে পড়ল সেটা তো ঢিলের ভিতরের কোনও শক্তির জন্য নয়। বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে ছুঁড়ে দেওয়া হল বলেই এটা ঘটতে পারল। সুতরাং ভাবা হল, বস্তুর গতির কারণ বাইরে। যেমন বন্দুকের ট্রিগার টেপা হল, ফলে গুলিটা বেরিয়ে গেল। সুতরাং এটাই ভাবা হল, এসব জড় পদার্থগুলো তখনই গতি পায় যখন বাইরে থেকে তার উপর একটা বল বা শক্তি প্রয়োগ করা হয়। যদি কখনই কোনও বল প্রয়োগ না করা হয়, তবে বস্তু অ্যাবসোলিউট রেস্ট-এ (চিরকাল স্থির) থাকবে। এসব কিছুকে ভিত্তি করে নিউটনিয়ান মেকানিক্সে একথাই ভাবা হয়েছে যে, গোটা বস্তুজগতকেই বাইরে থেকে ইনফিনিট ডিগ্রিতে (অসীম মাত্রায়) একটা শক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলেই বস্তুজগৎ আবহমানকাল গতিশীল আছে এবং থাকবে। এই বাইরে থেকে বল বা শক্তি কে দিল, কীভাবে দিল, সেদিন বিজ্ঞান তার সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তাই নিউটন একে ফার্স্ট

ইমপালস (প্রথম ধাক্কা) বা চালিকাশক্তির প্রাইম মুভার-এর (প্রাথমিক উৎসের) সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অ্যাটমকে যখন ভাঙা গেল, এবং ভেঙে এইসব সাব-অ্যাটমিক বস্তুকণা পাওয়া গেল, যেটা একটু আগেই আলোচনা করেছি, তখন তার ভিত্তিতে এই পার্টিকল্ থিওরি (কণাতত্ত্ব) এবং আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরি (আপেক্ষিকতার তত্ত্ব) আবিষ্কারের পর স্পেস-টাইম-গ্র্যাভিটি'র যে নতুন ধারণা এসে গেল, তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বস্তুজগতের গতিশীলতার বা বস্তুর গতির মুখ্য কারণ বাইরে নয়, ভিতরে। এরও আগে বিজ্ঞানে এটা স্বীকৃত ছিল যে, কোনও বস্তুর মধ্যে অণু বা পরমাণুগুলো যে পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করে, সেই ধাক্কাধাক্কিটা কখন কতটা হবে, কম হবে কি বেশি হবে, বা কীভাবে হবে সেটা নির্ভর করে বস্তুর বিশেষ ধরনের অবস্থার উপর — স্টেট অব অ্যাগ্রিগেশন অব ইটস কন্সটিটুয়েন্ট ফাইনার পার্টিক্‌ল্‌স (বস্তুর গঠনগত অবস্থার উপর)। বস্তু যখন বায়বীয় অবস্থায় বিরাজ করে তখন তার মধ্যে ধাক্কাধাক্কি খুব বেশি, তরল অবস্থায় তার চেয়ে কম, আবার একেবারে কঠিন অবস্থাতে বস্তু যখন অবস্থান করে তখনও তার অনুর মধ্যে গতি আছে, কিন্তু বায়বীয় বা তরল অবস্থার চেয়ে তা অনেক কম। যখন আমরা কোনও কঠিন পদার্থকে কোনও প্রক্রিয়ায় তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করি, তারপর বায়বীয় বা গ্যাসীয় অবস্থায় সেটা পৌঁছায়, তখন সেই ধাক্কাধাক্কিটা আবার অনেক গুণ বেড়ে যায়। এটা হল একটা দিক।

আরও একটি দিক এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আগে একটা সময় ছিল যখন বিজ্ঞানে ম্যাটার (বস্তু) এবং এনার্জি (শক্তি) এই দু'ভাগে ভাগ করা হত, বস্তু এবং তার শক্তি ও রূপকে বোঝাবার জন্য। আজকাল বিষয়টাকে এভাবে দেখা হয় না। আজকাল সঠিকভাবেই বলা হয় মাস (ভর) এবং শক্তি। আসলে ভর এবং শক্তি হচ্ছে ডিফারেন্ট ফর্মস অব এগজিসটেন্স অব ম্যাটার (বস্তুর অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ)। বস্তুর একটা রূপের নাম হচ্ছে শক্তি, আর একটা রূপের নাম হচ্ছে ভর। বস্তুর গতির মুখ্য কারণ যে ভিতরে, বাইরে নয়, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু এটুকুই বুঝলে চলবে না। বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ বলছে, মোশন ইজ দ্য মোড অব এগজিসটেন্স অব ম্যাটার (গতি হচ্ছে বস্তুর অবস্থানের ধরন)। বস্তু অবস্থান করছে মানেই হল সে গতির মধ্যে অবস্থান করছে। সে কারণে বলা হচ্ছে, বস্তুর অস্তিত্বের ধরনই হচ্ছে গতি। অর্থাৎ গতিহীন বস্তু বলে কিছু নেই এবং থাকতে পারে না।

এইসব বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা কী হবে বিজ্ঞান আজ তা সন্দেহাতীতভাবে, স্পষ্টভাবে ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছে। আমরা জানি, কার্ল মার্কস বহু আগেই হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে তার ভাববাদী আবরণ থেকে মুক্ত করে দেখিয়েছেন যে, সমস্ত বস্তুর মধ্যেই পরস্পরবিরোধী শক্তি, পরস্পরবিরোধী ঝোঁক আছে যাদের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া কাজ করছে — একে বলা হয় বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্ব। আবার প্রতিটি বিশেষ বস্তু বহির্জগতের সমস্ত বস্তুর সাথেই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সম্পর্কযুক্ত, যাকে বস্তুর বহির্দ্বন্দ্ব বলা হয়। এই দুই দ্বন্দ্বই বস্তুর গতির কারণ। কিন্তু বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এই দু'য়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বই হচ্ছে বস্তুর গতির মুখ্য কারণ। মার্কসবাদের এই মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি যে পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

স্পেস ও টাইম সম্পর্কে সঠিক ধারণা

এখানে এক কমরেড জানতে চেয়েছেন যে, সম্প্রতি কিছু সোভিয়েট পত্রপত্রিকায় নাকি গতি, সময় এবং স্পেস এ সব কিছুকেই বস্তুর অবস্থানের রূপ বলা হয়েছে — এই ধারণা সঠিক কিনা। আমি একটু আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি, গতি হচ্ছে বস্তুর অবস্থানের ধরন। বস্তু মানেই সে গতিশীল। গতিহীন কোনও বস্তু থাকতে পারে না। ফলে গতিকে বস্তুর অবস্থানের রূপ বলা সঠিক নয়। এ সম্পর্কে কোনও কোনও শিক্ষাশিবিরে এর আগে আমি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি। আসল কথা, স্পেস এবং টাইম বস্তুর বিয়িং-এর (অস্তিত্বের) সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তু আছে মানেই তা স্পেস এবং টাইম-এ আছে। স্পেস এবং টাইম বাদ দিয়ে বস্তুর অবস্থান বা অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না, আবার বস্তুকে বাদ দিয়ে স্পেস এবং টাইম-এর চিন্তা অলীক। অ্যাবসোলিউট ভ্যাকুয়াম (একেবারে শূন্যস্থান) বলে কিছু নেই। মহাজাগতিক শূন্য বলে যাকে বলা হয় সেখানেও বস্তু বিকিরণ রূপে এবং সামান্য গ্যাস বা ধূলিকণা রূপে আছে। টাইম এবং স্পেস হচ্ছে কন্ডিশনস্ অব

এগ্‌জিসটেন্স অব ম্যাটার (বস্তুর অবস্থানের শর্ত)। তাই আবার বলছি, বস্তু আছে মানেই হল কিছু সময় ধরে তা অবস্থান করছে ও পরিবর্তিত হচ্ছে। আবার বস্তু আছে মানেই হল, বস্তু স্পেস-এ অবস্থান করছে ও গতিশীল অবস্থায় আছে। তাই টাইম এবং স্পেস উভয়কেই বস্তু থেকে, তার অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ফলে বিষয়টাকে এভাবে বোঝা দরকার যে, বস্তু অবস্থান করছে মানেই হল, সে সময় এবং স্পেস-এ অবস্থান করছে। এই হল তার অস্তিত্বের শর্ত। স্পেস অ্যান্ড টাইম আর দ্য কন্ডিশানস্‌ ইন হুইচ ম্যাটার এগজিস্টস*। অর্থাৎ স্পেস এবং সময় হচ্ছে বস্তুর অবস্থানের অপরিহার্য শর্ত আবার এটাও মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্য সব সাধারণ বা মৌলিক ধারণার মতোই স্পেস-টাইমের ধারণাও অনড় বা অপরিবর্তনীয় নয়, বিশেষ মেটিরিয়াল ডোমেইন-এর (বস্তুগত পরিমণ্ডলের) যে বিশেষ প্রকৃতি সেটার নিরপেক্ষ কোনও ধারণা নয়। নিউটনিয়ান পরিমণ্ডলে স্পেস-টাইমের যে বিশেষ প্রকৃতি ও তাৎপর্য, তা রিলেটিভিস্টিক মোশন-এ স্পেস-টাইমের বিশেষ প্রকৃতি ও তাৎপর্য থেকে আলাদা, আবার ক্ষুদ্রকণার বা মাইক্রোপার্টিকল-এর যে পরিমণ্ডল, যা 'কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ল' দিয়ে পরিচালিত, তার বৈশিষ্ট্য থেকেও আলাদা।

শুধু তাই নয়, আজ স্পেস-টাইমকে একসঙ্গে যুক্ত করে ভাবা হচ্ছে, যার ভিত্তিতে স্পেস-টাইম-কনটিনিউয়াম-এর ধারণা গড়ে উঠেছে, স্পেস-টাইম-সমীকরণের কথা বলা হচ্ছে। এর উপর ফোর ডাইমেনশনাল জিওমেট্রির (চতুর্মাত্রিক জ্যামিতির ধারণা) দাঁড়িয়ে আছে। ইউক্লিডিয় জ্যামিতি অনুযায়ী দুটো বিন্দুকে যুক্ত করে আমরা সরলরেখা পেতে পারি। কিন্তু স্পেস বিজ্ঞান যেটা আজ গড়ে উঠেছে, বা কসমোলজি অর্থাৎ মহাবিশ্বকে জানার যে বিজ্ঞান, সেখানে ইউক্লিডের জ্যামিতি দিয়ে হবে না। মহাবিশ্বে গতিশীল বস্তু যেভাবে ছড়িয়ে আছে সে কারণেই স্পেস-টাইমের গঠনই এমন যে দুটো বিন্দুকে যুক্ত করলে সেটা সরলরেখা নাও হতে পারে, সেটা বক্ররেখাও হতে পারে। তাছাড়া সমতলের ধারণা, বক্রতলের ধারণা — এই সমস্ত ধারণা এমন বিচিত্র ধরনের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ইউক্লিডিয় জ্যামিতিতে সে সব আসবে না। তাই এই বক্রতলের ধারণাকে ভিত্তি করেই ইউক্লিডিয় জ্যামিতির পরে নন্‌-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি এসে গেছে।

ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির ধারণা, তাছাড়া যাকে আমরা ত্রিকোণমিতি বলি, এসব ভিত্তি করেই কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা বাড়িঘর তৈরি করেন। এটা ইউক্লিডের জ্যামিতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। যত সীমাবদ্ধতা নিয়েই আজ শুরু হোক না কেন, কসমোলজির (মহাবিশ্ববিজ্ঞানের) সাহায্যে ভবিষ্যতে বহু জিনিস জানতে পারা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মানুষ আজ মহাশূন্যে যাচ্ছে, বা প্রযুক্তি এতটা বিকাশলাভ করে গেছে যার ফলে ইন্টারস্টেলার স্পেস (সৌরজগৎ বহির্ভূত মহাকাশ) সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। এভাবেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘটছে। দেখুন, অল্প কথায় বলতে গেলে, গ্যালিলিও থেকে নিউটন, নিউটন থেকে আইনস্টাইন — ধাপে ধাপে বিজ্ঞান এভাবেই এগিয়ে চলেছে এবং এভাবেই সে এগোতে থাকবে। এর শেষ নেই। কেন? কারণ বিজ্ঞান যাকে জানছে, যার রহস্য সে উদ্‌ঘাটন করছে, সেই প্রকৃতিই অনন্তকাল ধরে এগিয়ে চলেছে। তার চলার শেষ নেই। ফলে বিজ্ঞানের জানারও শেষ হতে পারে না। তাই সত্যানুসন্ধানও শেষ হতে পারে না, কোনও জায়গায় থেমে যেতে পারে না। আজ যেটা সত্য বলে জানলাম, আগামীকালের অজানার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। যাঁরা বলেন, পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যা জানা যায় না, অজ্ঞেয়, তাঁদের ধারণা ঠিক নয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলছে, আমরা সবকিছুই জানতে পারি। সবকিছুই জানা যায়, কিন্তু সবসময়ই কিছু না কিছু অজানা থেকে যায়। তাই আমরা একথা বলতে পারি যে, আজও কিছু বিষয় আছে যেটা আমরা এখনও

---

* কান্টের দর্শনে space ও time-কে বলা হয়েছে *a priori*। এই ধারণার বিরুদ্ধে space ও time-এর objective character (বস্তুগত চরিত্র) দেখাতে, অর্থাৎ space ও time যে বস্তুগত ধর্ম (attributes), বস্তুর অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য রূপ, সেটা প্রতিষ্ঠা করতে এঙ্গেলস বলেছেন, "The basic forms of all beings are space and time, and existence out of time is just as gross an absurdity as existence out of space." (*Anti-Dühring*—Engels)। এর আগে ফুয়েরবাক্‌ বলেছিলেন, "Space and time are not mere forms of phenomenon but essential conditions of being." স্থান-কালে ব্যাপ্তির (extendedness in space and time) মধ্য দিয়েই বস্তুর অস্তিত্ব। সুতরাং বস্তুর অস্তিত্বের প্রকাশিত রূপ বা form-এর বিচারে স্থান-কাল হল অস্তিত্বের মূল ও অপরিহার্য রূপ — Space and time are the basic forms of being। Space ও time হল matter in motion-এর conditions of existence। বস্তুপ্রকৃতি বা বস্তুধারণার এই বিচার থেকেই শিবদাস ঘোষ space ও time-কে conditions of existence of matter বলেছেন।

জানতে পারিনি, এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। সেগুলোও জানা যাবে, কিন্তু সেগুলো জানতে জানতে আবারও কিছু অজানা থেকে যাবে। এই জানা ও অজানার সংঘাতের মধ্য দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি।

সুতরাং সত্য কী এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ সত্য একটাই। তাই বলা হয় সত্য বিশেষ, আপেক্ষিক এবং চূড়ান্ত, যাকে অন্য ভাষায় বলা হয় অমোঘ। কিন্তু এই যে বিশেষ সত্য, এই সত্য বিশেষ হলেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে। অর্থাৎ মানুষে-মানুষে সত্য ধারণা, সত্যোপলব্ধির তারতম্য ঘটতে পারে। কিন্তু তার জন্য সত্যটা ভিন্ন হয়ে যায় না। সত্য যা আছে তাই। আবার আজ যেটাকে বিশেষ সত্য হিসাবে জানছি, তারও বিকাশ ঘটে। কেননা, যাকে জানছি তারও পরিবর্তন ঘটছে, বিকাশ ঘটছে। আবার যে মানুষ জানছে সেও পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে বলা যায়, যা দিয়ে জানছি সেই যন্ত্রেরও উন্নতি ঘটছে, পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে শাশ্বত জ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না। যে বিশ্বজগতকে আমরা জানছি সে নিজেই তো ইনফিনিট (অনন্ত)। আবার এই অনন্তের ধারণাও এক থাকতে পারে না। সেটাও পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তনশীল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ইনফিনিট বা অনন্তের পুরনো ধারণা সীমায়িত হয়ে যায়। তার ফলেই দেখা যায়, এই সীমায়িত অনন্ত ও সীমাহীন অনন্তের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ক্রমাগত কাজ করছে। তাই আবার বলছি, জানার শেষ নেই। আজকে যেসব বিষয় আমাদের জানা নেই, যখনই সেগুলো জানা হয়ে গেল তখন দেখা গেল, আরও অনেক কিছু অজানা জিনিস আমাদের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই জ্ঞানও শাশ্বত হতে পারে না, সত্যও শাশ্বত বা অ্যাবসোলিউট হতে পারে না। সেই কারণেই সত্য শুধু বিশেষ সত্যই নয়, সত্য আপেক্ষিক সত্য। বিশেষভাবে, বিশেষ অবস্থায় বিশেষীকৃত রূপেই সত্যের অবস্থান। তাই একই বিষয়ে সত্য একটাই হয়, হাজারটা হয় না। সত্য নেই তা নয়। সত্য আছে, কিন্তু আছে বিশেষ রূপে। নির্বিশেষ সত্য বা শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। সত্য আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে, মানুষকে নিত্য নতুন জয়যাত্রার অস্ত্র জোগাচ্ছে।

শাশ্বত সত্যের ধারণা অলীক

শাশ্বত সত্য নেই বলে মন খারাপ করার কিছু নেই, বরঞ্চ আনন্দিত হওয়ার কথা। কেননা, শাশ্বত জ্ঞানের সাহায্যে আমরা শুধু অকম্মার ঢেঁকি হতে পারি, কোনও কাজ করতে পারি না। কারণ সেটা মনগড়া ধারণা, তার কোনও ধার নেই। আবার দেখুন, জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বারবারই একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে যে, 'অ্যাবসোলিউট বা আদি বলে কিছু নেই বলে যে বলা হচ্ছে, সেকথা ঠিক নয়।' কেউ কেউ বলছেন, 'জিন'-এর কিছু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা উপাদান আছে যা অপরিবর্তনীয় এবং অ্যাবসোলিউট। এই বক্তব্যের সপক্ষে তাঁরা উদাহরণ দিচ্ছেন যে, মানুষের ক্ষেত্রে কতকগুলো বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় — যেমন, বংশপরম্পরায় প্রায়ই চেহারার মিল পাওয়া যায়। তাছাড়া বেশ কিছু রোগ আছে যাদের বলা হয় বংশানুক্রমিক ব্যাধি — যেমন বাত, বহুমূত্র ইত্যাদি। আবার রেস (জাতি) বা ট্রাইব-এর (উপজাতির) ক্ষেত্রেও অনেকে তাদের গায়ের রং বা শারীরিক কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে মনে করেন, বিশেষ বিশেষ জাতি হচ্ছে আদি, একেবারে বিশুদ্ধ।

আমি জাতির কথায় পরে আসছি। যেসব বংশগত বৈশিষ্ট্যের কথা আগে উল্লেখ করা হল সেগুলোকে সামনে রেখেই জিন-এর অ্যাবসোলিউট বৈশিষ্ট্যের কথা আসছে। জীবজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি ঘটে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই, এরকম ধারণা যে বিজ্ঞানসম্মত নয়, সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। ফলে যেখানে জিনগত উপাদান এবং পরিবেশ এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে সেখানে জিন-এর কোনও পরিবর্তন ঘটছে না, সেটা অপরিবর্তিতই থাকছে, এরকম চিন্তা অবাস্তব। কারণ, তাহলে জিনঘটিত পরিবর্তনের ফলে বংশধরদের মধ্যে বংশানুক্রমিক মিউটেশন (পরিবর্তন) বা নতুন প্রজাতির জন্ম সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আধুনিক জীবনবিজ্ঞান এবং জিনতত্ত্ব এ ধরনের বক্তব্যকে মেনে নিতে পারে না। এই যে বংশপরম্পরায় সাদৃশ্যের কথা বলা হল, এই সাদৃশ্যের ব্যাপার কি এরকম যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আবার যেখানে চেহারার মিল আছে সেখানেও বাকি সমস্ত ট্রেইট-এর (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের) ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য দেখা যায়, একথাও সত্য নয়। সুতরাং হেরিডিটি (বংশগতভাবে পাওয়া বৈশিষ্ট্য) বা জিন-এর ক্ষেত্রে অ্যাবসোলিউট বা আদি বলে কিছু

থাকতে পারে না। জিনতত্ত্বের, বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে, যেমন অগ্রগতির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, আবার জিনতত্ত্বের নামে বাড়াবাড়ি করার ঝোঁকও আজকাল দেখা যাচ্ছে। আমরা জানি, চিকিৎসাবিজ্ঞানে বহু বিষয় আছে যেখানে অনেক কিছু জানার বাকি আছে। লিভার কীভাবে কাজ করে, তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে আমরা অনেক রোগ থেকে মুক্ত হতে পারি, সে সব জানার জন্য বহু গবেষণা হচ্ছে। মানুষের দেহের মেটাবলিক ফাংশন (বিপাকীয় ক্রিয়ার) সাথেই মেটাবলিক ডিজিজ-এর (বিপাকীয় রোগের) সম্পর্ক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার নাম করেই যদি কেউ বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তাকেই সত্য বলে চালাতে চান তাহলে তা মেনে নেওয়া যায় না।

বংশগতভাবে পাওয়া বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ যে পরস্পর জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় সম্বন্ধযুক্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েও একদল বিজ্ঞানী প্রচার করছেন যে, মানুষের সৃজনশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি বা চারিত্রিক গুণাবলী বিশেষ বিশেষ জিন-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদাহরণ হিসাবে এমন বক্তব্যও এসেছে যে, অঙ্ক করার বিশেষ পারদর্শিতার পিছনে এক ধরনের জিন কাজ করে, সঙ্গীতের পারদর্শিতার পিছনে আর এক ধরনের জিন-এর ভূমিকা আছে ইত্যাদি। অর্থাৎ এঁরা মানুষের মনন, আবেগ, সৃজনশীলতা এ সব কিছুকেই বিশেষ বিশেষ জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করেন ও প্রচার করেন। কিন্তু মস্তিষ্ক সম্পর্কিত আধুনিক শারীরবিজ্ঞানই আমাদের শিখিয়েছে, মানুষের মনন, সৃজনশীলতা, আবেগ ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের সাথে প্রধানত যুক্ত যা অন্য জীবের মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এই যে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ স্তরে মানুষের বিশেষ বিশেষ সৃজনশীলতার বিশেষ বিকাশ ঘটেছে — যেমন একটা যুগে দেখতে পাই ধর্মপ্রচারকদের, একটা যুগে বড় বড় সঙ্গীত শিল্পীদের, আবার একটা যুগে মহান বিজ্ঞান প্রতিভাদের — এই সব কি বিশেষ বিশেষ জিন-এর বিশেষ বিশেষ যুগে প্রোলিফারেশন-এর (দ্রুতহারে বৃদ্ধির) ফল? এহেন চিন্তা কি বিজ্ঞান বা যুক্তিসম্মত? সুতরাং মানতেই হবে, এক্ষেত্রে পরিবেশ, বিশেষ করে সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফলে বংশগতভাবে পাওয়া বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশের পরস্পর সম্পর্ক, বিশেষ করে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজ পরিবেশের ভূমিকা আমাদের এভাবেই বুঝতে হবে।

আবার দেখুন, আমরা যে জাতি বলি, উপজাতি বলি, এসব ক্ষেত্রে একটা বদ্ধমূল ধারণা প্রায়ই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ কিছু জাতি বা উপজাতি একেবারে বিশুদ্ধ বা মৌলিক। যাঁরা ইতিহাস বা জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর রাখেন তাঁরা জানেন, বিশুদ্ধ বা মৌলিক জাতি বলে কিছু নেই। কেউ যদি পিওর ব্লাড-এর (বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র জাতির) কথা বলেন তাঁদের বুঝতে হবে, অবিমিশ্র জাতি বলে কিছু নেই। সকলেই ক্রশ-ব্রিডিং-এর (সংকর প্রজননের) প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে সেই অতীত যুগ থেকে। মঙ্গোলয়েড, পালা অ্যালপাইন, অস্ট্রালয়েড বা ইজিপশিয়ান এরকম কোনও জাতিই অবিমিশ্র বা মৌলিক জাতি নয়। সেই একই কারণে বিশুদ্ধ আর্য রক্ত বা আদি আর্য জাতি বলে কিছু নেই। অথচ এরকম একটা অনৈতিহাসিক ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এক অদ্ভুত চিন্তাধারা আমাদের দেশে চলেছে, যার সঙ্গে মিশে গেছে তথাকথিত উঁচুজাত-নিচুজাতের ধারণা। এই জাতপাতের প্রশ্নে কী জঘন্য বৈষম্য ও সামাজিক অত্যাচার চলছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একথা মনে রাখা দরকার, দুনিয়ায় কেউ ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয়ে জন্মায়নি। জন্মেছে মানুষ হিসাবে। অতীত দিনের ইতিহাস ঘাঁটলে সহজেই জানা যায়, কীভাবে রাজতন্ত্রের যুগ থেকে ব্রাহ্মণদের দাপটে তথাকথিত নিচুজাত বা শূদ্ররা অন্যায়, অবমাননা, হীনমন্যতার শিকার হয়েছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজটি অবহেলিত ও অপূরিত থাকার ফলে জাতপাতের সেই অভিশাপ আজও সমাজকে বহন করতে হচ্ছে। বুর্জোয়া দলগুলি, এমনকী বাম নামধারী দলগুলি তাদের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে, নির্বাচনী স্বার্থে এই জাতপাত-ধর্ম-বর্ণকে কাজে লাগিয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।

যাই হোক, আপনারা মনে রাখবেন, যে কারণে শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই, সেই একই কারণে শাশ্বত নীতি বলেও কিছু নেই। আবার শাশ্বত নীতি নেই কথাটার মানে এ নয় যে, কোনও নীতি নেই। এইরকম চিন্তা নীতিহীনতার নামান্তর। আপনি জানুন বা নাই জানুন, বুঝুন বা নাই বুঝুন, সচেতন থাকুন আর নাই থাকুন, কোনও না কোনও নীতি বা আদর্শ আমাদের সমস্ত কাজকে পরিচালনা করছে, জীবনকে পরিচালনা

করছে। কিন্তু সেই আদর্শ অনড় নয়, সেটাও পরিবর্তনশীল। মার্কসবাদের উপলব্ধি তাই। আর এই কারণেই মার্কসবাদ ডগমা নয়। এই অর্থেই মার্কসবাদী দর্শন অন্য সমস্ত দর্শন থেকে — তা সে ভাববাদী দর্শনই হোক, বা সাধারণ বস্তুবাদী দর্শনই হোক, মূল চরিত্রগত দিক থেকেই ভিন্ন। পার্থক্যের মূল বুনিয়াদটা এইখানে।

বস্তু সংক্রান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা

বস্তু সংক্রান্ত ধারণা যাকে বস্তু ধারণা বলা হয়, যে আলোচনা আমি পরে করব বলে গেছি, তার কিছু কিছু দিক আমি এখন আপনাদের কাছে বলে যেতে চাই। অ্যাটম ভেঙে যে বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা পাওয়া গেছে এবং এ ব্যাপারে বহুদিন আগেই যে বৈজ্ঞানিকেরা সফল হয়েছেন, একথা আগেই আলোচনা হয়েছে। আমরা বোঝবার সুবিধার জন্য শুধু ইলেকট্রনের উদাহরণের মধ্যেই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। এক সময়ে প্রশ্ন দেখা দিল, ইলেকট্রনের চরিত্র কী? এটা কি পার্টিক্‌ল (কণা), নাকি ওয়েভ (তরঙ্গ)? প্রথমদিকে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল, ইলেকট্রনের চরিত্র হচ্ছে কণা চরিত্র। কিছু কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতেই তাঁরা এরকম চিন্তা করেছেন। পরবর্তীকালে তত্ত্বের সাহায্যে লুই ডি ব্রগলি দেখালেন, ইলেকট্রনের তরঙ্গ চরিত্রও আছে। পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা এসব নানা ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলতে শুরু করেন, পদার্থবিজ্ঞানে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী বললেন, ইলেকট্রন আসলে একইসাথে কণা ও তরঙ্গ। তাঁরা আরও বললেন, ইলেকট্রনের আচরণ বা চরিত্র কোন সময়ে কী হবে সেটা নির্ভর করে কন্ডিশন অব এক্সপেরিমেন্ট-এর (পরীক্ষানিরীক্ষার বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির) উপর। কথাটার মধ্যে সত্যতা থাকলেও, এর দ্বারা ইলেকট্রন সংক্রান্ত ধারণার কমপ্রিহেনসিভ (পূর্ণাঙ্গ) উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটা ফাঁক থেকে যায় বলে আমার মনে হয়েছে। যাই হোক, সংকটের সমাধানের একটা সূত্র অবশ্য ডি ব্রগলি-ই দেখিয়ে গেছেন যেটা বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশ ও তথাকথিত সংকটের অন্যান্য দিকের সমাধানে সাহায্য করেছে।

ডি ব্রগলি দেখালেন, শুধু ইলেকট্রন বা ইলেকট্রনের মতো মাইক্রোপার্টিকল (ক্ষুদ্রকণা)ই নয়, এমনকী যাদের ম্যাক্রোবডি (বৃহৎ বস্তুপিণ্ড) বলা হয়, সবই একইসাথে কণা ও তরঙ্গ চরিত্র নিয়ে বিরাজ করছে। এদের মধ্যে তফাৎটা হল শুধু এই যে, বৃহৎ বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রে কণা চরিত্র যেখানে প্রবল, সে অনুপাতে তরঙ্গ চরিত্র এতই নগণ্য যে তা নেই বললেই চলে। আর ক্ষুদ্রকণার ক্ষেত্রে কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্মই সমান গুরুত্ব নিয়ে বিদ্যমান। এসব পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে অন্তত একটা বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া গেল যে, বস্তু আসলে একই সাথে ভর এবং শক্তির বৈশিষ্ট্যের ডায়ালেকটিক্যাল ইউনিটি বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়, কণা এবং তরঙ্গের চরিত্রের ডায়ালেকটিক্যাল ইউনিটি বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয় — যাকেই বলা হয় ওয়েভ-পার্টিকল ডুয়ালিটি (তরঙ্গ-কণা দ্বিত্ব)।

কিন্তু এর পরেও কিছু কিছু প্রশ্নে বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে কিছু গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রথমে হাইজেনবার্গ-এর আনসার্টেনটি প্রিন্সিপ্‌ল (অনিশ্চয়তা তত্ত্বের) উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি তাঁর অনিশ্চয়তা তত্ত্বে দেখালেন, একটিমাত্র ইলেকট্রন বা যে কোনও সূক্ষ্মকণার অবস্থান এবং ভরবেগ একইসাথে নিখুঁতভাবে আমরা জানতে পারি না। সহজভাবে অনেক সময় এটাকেই বলা হয়, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব বা প্রিন্সিপল অব ইনডিটারমিনেসি (অনির্ধারণীয়তার তত্ত্ব)। এটাই এর মূল কথা। সেখানে অবস্থান যত নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা হবে, ভরবেগ নির্ণয় ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে ভরবেগ যত নিখুঁতভাবে মাপা হবে, অবস্থান নির্ণয় ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী, যে কোনও বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ একইসাথে নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব। ফলে বস্তুর ভবিষ্যৎ অবস্থান বা ভবিষ্যৎ গতিপথ আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, যার প্রয়োগ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার জগতে, এই ভবিষ্যৎবাণী সুনির্দিষ্টভাবে করা সম্ভব নয়। আর যেহেতু এই পরিমণ্ডলে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে সেই কারণে এই অনিশ্চয়তা কথাটা নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। সে সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি আজও বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের মধ্যে রয়ে গেছে এবং সুযোগ পেলেই বস্তুবাদ অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে একে ভিত্তি করে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। আমি হাইজেনবার্গের এই আবিষ্কারের

মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাইনি যাতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের কোনও সুযোগ থাকে। প্রথমত, সমস্ত বৈজ্ঞানিক জানেন, আমরা এখন যে ক্ষেত্রের কথা আলোচনা করছি সেটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সেখানে প্রতিমুহূর্তে সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ইনটারঅ্যাকশন হচ্ছে। আর বিষয়টা এমনও নয় যে, আমরা অবস্থান বা ভরবেগ কোনও কিছুই জানতে পারি না। না, বিষয়টা সেরকম নয়। আমরা দুটোই জানতে পারি, কিন্তু একইসঙ্গে দুটোই নির্ভুলরূপে জানতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে পরিমণ্ডলের কথা বলা হচ্ছে সেখানে এটাই স্বাভাবিক। কারণ এই পরিমণ্ডলে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করছে। প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের পিছনে যে কারণ কাজ করে সে কারণও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। হাইজেনবার্গ সূক্ষ্মকণার এই গতিপ্রকৃতিকে একটা ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন-এর (গাণিতিক বর্ণনার) দ্বারা প্রকাশ করেছেন। সেটা ইক্যুয়েশন নয়, সেটাকে ইনইক্যুয়েশন বলা হয়। মাইক্রো-পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব প্রযোজ্য, কিন্তু ম্যাক্রো-পরিমণ্ডলে এই তত্ত্ব কাজ করে না। সেখানে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব কাজ করে। অনিশ্চয়তা তত্ত্ব ব্যাপারটা এমন নয় যে, সব নিয়মের বাইরে এটা একটা পুরোপুরি নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা। বিষয়টা মোটেই সেরকম নয়। আমি একথাই বলতে চাইছি যে, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব থেকে এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, মাইক্রো-পরিমণ্ডলে কার্যকারণ সম্পর্ক অচল। এরকম ধারণা ভ্রান্ত এবং নিঃসন্দেহে সেটা বিজ্ঞানবিরোধী। বরং এই পরিমণ্ডলেও কার্যকারণ সম্পর্ক এবং ডিটারমিনিজম কাজ করছে এবং তার ধারণাটা এখানে আরও বিকশিত হল।

প্রোবাবিলিটির ধারণা নির্ধারণবাদকে পূর্বনির্ধারণবাদের ধারণা থেকে মুক্ত করেছে

অনিশ্চয়তা তত্ত্বের এই দিকটি ছাড়াও আরও একটি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে সংশয় রয়ে গেছে, তাহল, ইলেকট্রনের গতিপ্রকৃতি ল অব প্রোবাবিলিটির দ্বারা যে পরিচালিত তার ব্যাখ্যা নিয়ে। এখন ল অব প্রোবাবিলিটি যেহেতু একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম তাই বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুললেন, এতদিন ধরে প্রকৃতিজগতে নানা পরিবর্তনকে যেভাবে ডিটারমিনিস্টিক (নির্ধারণবাদী) বলে বলা হয়েছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই অনিশ্চয়তা তত্ত্বের ফলে সেই ডিটারমিনিজম (নির্ধারণবাদ) যেন অচল হয়ে পড়ল। অর্থাৎ একটা যেন আর একটার বিরোধী, দুটো যেন এক সঙ্গে খাপ খায় না। আর নির্ধারণবাদ যদি মার খায় তার মানে দাঁড়াবে, কার্যকারণ সম্পর্ক আর থাকে না। এ বিষয় নিয়ে যে সংশয় সেদিন দেখা দিয়েছে, আমার মনে হয়েছে, বিজ্ঞানী মহলে বোধ করি সে সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। বিজ্ঞানীদের মধ্যেই এসব প্রশ্নে অনেক মতভেদ এবং জটিলতা রয়ে গেছে। আমার নিজের ধারণা অবশ্য অন্যরকম। ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিকস-এ নির্ধারণবাদকে যেভাবে ভাবা হয়েছিল সে ধারণার মধ্যে যান্ত্রিকতা রয়েছে। ম্যাক্রো-পরিমণ্ডলে কোনও একটা গতিশীল বস্তুর প্রারম্ভিক অবস্থান ও গতিবেগ জানা থাকলে অঙ্ক কষে বলা যায়, বস্তুটি নির্দিষ্ট সময় পরে কোথায় পৌঁছাবে বা কতক্ষণ বাদে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাবে। অর্থাৎ বস্তুর আগের অবস্থা পরের অবস্থাকে নির্ধারণ করছে। আগের অবস্থা আবার তারও আগের অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত। বিষয়টাকে এইভাবেই দেখা হয়েছে। এই ধারণা গ্যালিলিও-নিউটনের সময় থেকে এভাবেই চলে এসেছে। অঙ্ক কষে বলা হচ্ছে, আর আমরা ফলটা সেই মতো পেয়ে যাচ্ছি। এর থেকে ফর্মাল যুক্তি করলে দাঁড়ায়, কোনও একটি ঘটনা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত, অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনা পূর্বনির্ধারিত। দেখাই যাচ্ছে, নির্ধারণবাদ সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তাভাবনার মধ্যে পূর্বনির্ধারণবাদের ঝোঁক কাজ করছে।

আমি যেভাবে বুঝেছি, সেটা হল, ল অব প্রোবাবিলিটির সাহায্যে যখন ইলেকট্রনের অবস্থানকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে তখন তার একটা সম্ভাব্য অবস্থানকেই বোঝানো হয়েছে, আগের মতো নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থানের পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট রিজিয়ন-এর (সীমার) মধ্যে তার সম্ভাব্য অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। তার জন্য প্রোবাবিলিটি ল প্রয়োগ করে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি সেটা কোনও সিদ্ধান্ত নয়, বিষয়টা কিন্তু তেমন নয়। সিদ্ধান্তটা কতকটা অ্যাপ্রক্সিমেশন-এ (সম্ভাবনার প্রায় কাছাকাছি) ধরতে হচ্ছে, বা ডেফিনিট প্রোবাবিলিটি-র (সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনার) ভিত্তিতে ভিউ করা (ধরে নেওয়া) হচ্ছে। সম্ভাবনার প্রায় কাছাকাছি বা প্রোবাবিলিটিভিত্তিক সিদ্ধান্তও এই অর্থে যুক্তিদ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্ত ও একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত। একইভাবে সম্ভাব্যতা-ভিত্তিক সত্যও সত্য। সেটা কোনও সত্য নয়, এরকম নয়।

এটা হল একটা দিক।

এর আগে আমরা দেখেছি, এতদিন ধরে নির্ধারণবাদ সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিকতা ছিল। নির্ধারণবাদের এই ধারণা আসলে পূর্ব-নির্ধারণবাদের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ কারণেই অনেকে নির্ধারণবাদকে ফ্যাটালিজম (নিয়তিবাদ) বলে মনে করতেন। সুতরাং আমি মনে করি, আধুনিক বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তা তত্ত্ব এবং মাইক্রো-পরিমণ্ডলের নানা বিষয়কে ভিত্তি করে প্রোবাবিলিটির এই ধারণা আসার পর সেটা নির্ধারণবাদকেই উড়িয়ে দিল বা কার্যকারণ সম্পর্কের মূলে আঘাত করল, বিষয়টা মোটেই সেরকম নয়। এই বিষয়টাকে আমাদের এভাবে বোঝা দরকার যে, প্রোবাবিলিটির নিয়ম আসলে নির্ধারণবাদকে পূর্বনির্ধারণবাদের হাত থেকে মুক্ত করে তাকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাল। বস্তুজগতের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেখানে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়, একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে যেখানে আর একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে যাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব বলা হয়, মাল্টিপ্লিসিটি অব কনফ্লিক্ট-এর (দ্বন্দ্বের বহুত্বের) মধ্যেই যার অবস্থান — এরকম পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকেই বিষয়গুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। কেননা কোনও বস্তু বা সত্তার মধ্যে যখন বহু শক্তির সমাবেশ ঘটে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই যেখানে পরিবর্তন চলতে থাকে, এরকম অবস্থায় সেই পরিবর্তনের ফলে কোথায় কী অবস্থায় তার পরিণতি ঘটবে সেটা আগে থাকতে বলা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে যে পরিবর্তন ঘটছে সেগুলো কিন্তু নিয়ম মেনেই ঘটছে। তাই কার্যকারণ সম্পর্ক না-মানা বা নির্ধারণবাদকে অস্বীকার করার কোনও প্রশ্নই বিজ্ঞানসম্মত নয়। শুধু এটুকু বুঝতে হবে, নির্ধারণবাদের এই নতুন ধারণা যান্ত্রিক নয়, বরং পূর্বনির্ধারণবাদ বা নিয়তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত।

বিপ্লবী জীবনে দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও সম্ভাব্যতার প্রয়োগ

এ বিষয়টিকে আমি আর একদিক থেকে ভাবতে বলছি। সেটা প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত নয়, বা আগে যেটা আলোচনা করলাম, বিষয়টা সেরকমও নয়। তবুও কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে এবং বিষয়টাকে গভীরভাবে বোঝার জন্য বলছি। পার্টির নেতা ও কর্মীদের বিকাশের বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমি কথাটা বলছি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, যেসব কর্মী পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে এক সঙ্গে কাজ করা শুরু করল তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কর্মী ক্রমাগত বেশি বেশি দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের ভাল কর্মী অর্থাৎ যোগ্য কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হল। কিন্তু বাকিরা গোড়ায় ভালভাবে শুরু করলেও শেষপর্যন্ত জীবনসংগ্রামে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আপস করে অনেক পিছিয়ে গেল। এ ধরনের পার্থক্য কেন ঘটে, এই প্রশ্নের জবাবে আমরা সাধারণভাবে যে কথাটা বলি, সেটা হল, এই দুই দল কর্মীর সংগ্রামপদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যের ফলেই এতখানি পার্থক্য ঘটে গেল। বিষয়টা এভাবে বোঝার মধ্যে মৌলিক কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু বিষয়টা আর একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, একজন কমরেড প্রতিমুহূর্তে যেমন লড়ছে তেমনি একইসাথে সে আপসও করে চলেছে। অর্থাৎ সংগ্রাম ও আপস একইসাথে সূক্ষ্মভাবে মনের গভীরে কাজ করে। এটা কাজ করে অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ নানা কারণে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বৈচিত্র্যময় এ জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটে যেটা আগে থেকে কেউ বলে দিতে পারে না। ফলে একজন কর্মী যার সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা যে, সে কর্মী হিসাবে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছে, তা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ জীবনে তার পরিণতি কী হবে সেটা কি আমরা আগে থাকতে বলতে পারি? পারি, আবার পারি না। আমরা যখন বলি, একজন কমিউনিস্টকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে হবে, একথা কেন বলা হয়? বলা হয় এই কারণেই যে, কোনও পরীক্ষাই আমাদের জীবনে চূড়ান্ত নয়। আজ একটা পরীক্ষায় যে সফলভাবে উত্তীর্ণ হল, ভবিষ্যতে আর একটা পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ নাও হতে পারে। এরকম ঘটনা ঘটে বলে কি আমরা বলতে পারি, এসব পরিবর্তনের পিছনে কোনও নিয়ম কাজ করে না ? নিশ্চয়ই সেটা ঠিক নয়। আবার নিয়ম কাজ করছে বলে একজন কমরেডের জীবনের পরিণতি কী হবে সেটা কি আগে থাকতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়? না, বলা যায় না। সুতরাং নির্ধারণবাদ কাজ করে একথা যেমন ঠিক, কিন্তু সেই নির্ধারণবাদ পূর্বনির্ধারণবাদ নয়, নিয়তিবাদ নয়। বরঞ্চ কমরেডদের জীবনের পরিণতি কী হবে সে সম্পর্কে আমরা সম্ভাব্য পরিণতি বলতে পারি। অর্থাৎ বলতে পারি সেটাই যেটা সম্ভাব্য। কিন্তু সম্ভাব্য মানে এ নয় যে, সেই পরিণতিটাই তার ক্ষেত্রে

নির্দিষ্ট, অনড় এবং নিশ্চিত পরিণতি। তা নয়। তাই মার্কসবাদের নির্ধারণবাদকে যাঁরা ফ্যালাসি-র (নানা তথাকথিত ভ্রান্ত যুক্তির) অভিযোগে অভিযুক্ত করে শুধু নির্ধারণবাদকেই নয়, এমনকী মার্কসবাদকেও নানা ছেঁদো কথা বলে বাতিল করে দিতে চাইছেন, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের আলোকে নির্ধারণবাদকে তাঁদের নতুনভাবে বুঝতে হবে।

'প্লুরালিটি অব কজেস'-এর তত্ত্ব সঠিক নয়

নির্ধারণবাদের প্রশ্ন ছাড়াও যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে ভাববাদীরা প্রায়শ মার্কসবাদকে আঘাত করতে, এমনকী নস্যাৎ করতে চান, এরকম একটি বিষয় হল প্লুরালিটি অব কজেস (কারণের বহুত্ব)। এদের বক্তব্য হল, একটি ঘটনা বহু কারণেই ঘটতে পারে, অর্থাৎ একটা ঘটনা ঘটবার পিছনে একটি কারণ কাজ করে, এ ধারণা ভুল। একথা ঠিক, মোটা অর্থে বা সাধারণভাবে অনেকেই বলে থাকেন, বহু কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে বা একটি বিশেষ ঘটনা ঘটার পিছনে বহু কারণ আছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা এক কথা, আর কথাটির দার্শনিক তাৎপর্য কী সেটা সঠিকভাবে বোঝা একেবারে ভিন্ন কথা। আমরা যখন কথাটা সাধারণভাবে বলি যে, ঘটনাটি ঘটার পিছনে বহু কারণ কাজ করেছে, এখানে কারণ কথাটাকে নানা বিষয় বা ফ্যাক্টর (ঘটনা) বা কন্ডিশন (পারিপার্শ্বিক অবস্থা) হিসাবে বুঝতে হবে। তার সাথে কারণের বহুত্ব কথাটার কোনও সম্পর্ক নেই।

কিন্তু আমরা যখন দার্শনিক দিক থেকে বিচার করি তখন ঐরকম মোটা অর্থে বুঝলে চলবে না। নির্ধারণবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা একটু আগে দেখলাম যে, শত সহস্র সম্ভাবনা যখন কোনও পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তা সে যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তখন আমরা বলতে পারি না, পরিবর্তনটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে পরিণতি লাভ করবে। যেমন, ক একটা সত্ত্বা যেটা খ, গ, ঘ এরকম অনেক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু কোথায় পৌঁছাবে সেটা আমরা আগে থেকে বলতে পারি না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ক থেকে খ, বা ক থেকে গ, বা ক থেকে ঘ পরিবর্তন যাই হোক — এই পরিবর্তনটা যখন ঘটে সেটা নিয়ম মেনেই নির্ধারিতভাবে ঘটছে। পরিবর্তনের ধারায় যেটা কাজ করে সেটা হল মাল্টিপ্লিসিটি অব কনফ্লিক্টস (দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বহুত্ব), কারণের বহুত্ব নয়। যে ঘটনাই ঘটুক তার পিছনে একটা বিশেষ কারণ থাকে।

দর্শনে একটা কনসেপ্ট (সিদ্ধান্ত) আছে, সেটা হল, কজ ইজ দি ইমিডিয়েট অ্যান্টিসিডেন্ট অব এফেক্ট (কারণ হচ্ছে কোনও ঘটনা ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তের পরিণত অবস্থা), অর্থাৎ যেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘটনাটি ঘটার মতো অবস্থা তৈরি হয়। বহু কিছু ফ্যাক্টর (ঘটনা) বা পারিপার্শ্বিক কন্ডিশন (অবস্থার) ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যখন পরিবর্তন সূচিত হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি দেখা দেয়, যাকে বলা হয় পরিস্থিতি ম্যাচিওরিটি (পরিণতি) লাভ করেছে, সেটাই হল ঘটনাটি ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তের অবস্থা। আর এই ঘটনাটি ঘটবার ঠিক আগের মুহূর্তের অবস্থায় যখনই পৌঁছাল তখনই আমরা ফলাফল পেয়ে গেলাম। এটাই হল সঠিক ধারণা। কারণের বহুত্বকে অস্বীকার করার মধ্যে অনেকেই নির্দিষ্ট কোনও রেজিমেন্টেশন-এর (ছাঁচে ঢালা) মতের গন্ধ পান। মনে করেন, যেন এর পিছনে গণতন্ত্রকে খর্ব করার, সকল মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করার মতলব কাজ করছে। সত্যে পৌঁছাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের মতের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং মত বিনিময়ের প্রয়োজনকে অস্বীকার করার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু তাই বলে কি একথা বলা চলে যে, সমস্ত ধরনের ভিন্ন মত, এমনকী পরস্পরবিরোধী মতও একই সাথে সঠিক এবং সত্য? বিজ্ঞান সেকথা মেনে নিতে পারে না।

তাছাড়া, পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলের হাত থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজতে গিয়ে আমরা যদি কারণের বহুত্বের ভ্রান্ত ধারণাকে সামনে রেখে মনে করি যে, শ্রেণীসমন্বয় এবং শ্রেণীসংগ্রাম এই দুইয়ের যে কোনও একটা পথেই আমরা মুক্তি পেতে পারি, তাহলে একথা বলতেই হবে, জেনে হোক, না জেনে হোক, এটা লোক ঠকাবার মস্ত বড় কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। আবার, আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদ —এ কথাটাকে যাঁরা মার্কসবাদীদের একটা আপ্তবাক্য বলে উড়িয়ে দিতে চান এবং যুক্তি করেন যে, হাজার একটা কারণ বর্তমান সমস্যার পিছনে আছে, তাঁরা এই হাজার একটা ফ্যাক্টর-এর পিছনে যে পুঁজিবাদই কাজ করছে এবং ক্যাপিটালিজম ইজ দি ইমিডিয়েট

অ্যান্টিসিডেন্ট অব অল দিজ প্রবলেমস টু ডে (পুঁজিবাদই যে আজকের দিনের এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ) — এ সত্যটা অস্বীকার করছেন।

যাই হোক, বস্তুজগতে বা জীবজগতে যে সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেই পরিবর্তন একমাত্র তখনই ঘটে যখন সেটা ঘটবার মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বা মার্কসবাদ যে প্রয়োজনের কথা বলে, তাহল, সেই প্রয়োজন যা সমস্ত গতি, সমস্ত কিছু আসার পিছনে কাজ করে। প্রয়োজন না থাকলে কোনও কিছু আসে না। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ডেভেলাপমেন্ট (অগ্রগতি), প্রতিটি গতি, প্রতিটি ল (নিয়ম), প্রতিটি প্রসেস-এর (কার্যক্রমের) মধ্যে প্রয়োজন আছে যেটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াটাই প্রয়োজনকে ইন্ডিকেট (চিহ্নিত) করছে। নিয়মের মধ্যে, নিয়মের পথ বেয়ে কার্যকারণ সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে যে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে সেটাকেই আমরা যথার্থ প্রয়োজন বলি। এই যে প্রয়োজনবোধ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কজ-এফেক্ট রিলেশনশিপ-এর (কার্যকারণ সম্পর্কের) ভিত্তিতে যে প্রয়োজন সে অর্থে প্রয়োজন কথাটা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন কথাটা ইউনিভার্সাল (সর্বজনীন) অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিটি বিশেষ ঘটনার পিছনে একটা কারণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমস্ত বস্তুজগতের পিছনে, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিছনে একটা কারণের প্রয়োজন আছে বলে কিছু নেই — এভাবে বললে আমরা মিস্টিসিজম (অতীন্দ্রিয়বাদ) বা ভাববাদের খপ্পরে পড়ে যাব, ভাববাদে বিচ্যুত হব।

প্রয়োজনের স্বীকৃতিই স্বাধীনতা

হেগেল যখন বলেছেন, ফ্রিডম ইজ দ্য রেকগনিশন অব নেসেসিটি (স্বাধীনতার অর্থ প্রয়োজনের স্বীকৃতি) , সেই প্রয়োজন কথাটার তাৎপর্য অনেক গভীর। স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি, মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ বিকাশের অধিকার। বিকাশের নামে উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়াকলাপ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। আমি তখনই স্বাধীন বা মুক্ত যখন মুক্তি কী সেটা আমি সঠিকভাবেই বুঝেছি এবং সেই বোধকে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে প্রয়োগ করছি । তাই স্বাধীনতা অর্জন মানেই হচ্ছে, বস্তুজগতের পরিবর্তনের নিয়মকে জেনে সেই অনুযায়ী নিজের উপর এবং বাইরের জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে প্রয়োজনবোধ সম্পর্কে স্বাভাবিক ও সঠিক জ্ঞানের স্বীকৃতির মাধ্যমে। স্বাধীনতার অর্থ প্রয়োজনের স্বীকৃতি — হেগেলের এই অভিব্যক্তিটা খুবই সুন্দর, অপূর্ব। হেগেল যেটা বলতে চেয়েছেন তার মর্মার্থ যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, একদিকে বস্তুজগতের পরিবর্তনের নিয়ম, অন্যদিকে মানুষের চিন্তাগত ক্ষেত্রে উপলব্ধি — এ দু'য়ের মধ্যে ফাঁক থাকলে প্রয়োজন সম্পর্কে একটা অন্ধ ধারণা গড়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে এই প্রয়োজন কথাটাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। তার সাথে হেগেলের চিন্তার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি আগেও অনেকবার বলেছি, আজকাল প্রয়োজন কথাটাকে অনেকেই ভীষণ সংকীর্ণ অর্থে দেখছেন যার থেকে প্র্যাগমেটিজম (প্রয়োজনবাদ) কথাটা এসেছে। কখনও কখনও দেখা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ বলছেন, ঈশ্বর আছে কি নেই এর মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, ঈশ্বর বিশ্বাসের দরকার আছে। সমাজে শৃঙ্খলা রাখতে হলে, নীতির ভিত্তিতে সমাজকে চালাতে হলে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। আমি এ ধরনের প্রয়োজনের কথা বলছি না। এই কথাগুলো এসেছে আসলে ঈশ্বর বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার কাজে লাগানোর অর্থাৎ প্র্যাগমেটিক (ব্যবহারিক) প্রয়োজনেই। এমনকী অনেকে ব্যবহারিক কথাটাকে একটা গৌরবের কথা বলে মনে করেন। রাজনীতিতে যাকে আমরা বলি সুবিধাবাদ, দর্শনে তাকেই বলা হয় প্রয়োজনবাদ। আসলে প্রয়োজনবাদ হচ্ছে সমাজপ্রগতির ধারাকে অস্বীকার করে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর আপাত এবং সংকীর্ণ স্বার্থেই অতি নিকৃষ্ট ধরনের সুবিধাবাদ, যেটা বাস্তবেই মার্কসবাদবিরোধী।

অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্ট

এখানে আর একটি বিষয় আলোচনা হওয়া দরকার। পরিবর্তন বলি, বা বিকাশ বলি, এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে আরও কিছু কথা এসেছে। যেমন অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্ট। বস্তুজগতের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই ঘটনাপরম্পরা যে ঘুরেফিরে বারবার সাইক্‌লস্‌-এর (পরিক্রমণের)

মতো আসে না, পুনরাবৃত্তি করে না, অর্থাৎ পরিবর্তনের ধারায় আমরা উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারি, কিন্তু পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পুরনো জিনিসটার যে পুনরাবৃত্তি ঘটে না, এটাকে বোঝাবার জন্যই এসেছে অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্টের কথা। আমরা জানি, প্রতিটি বিশেষ জিনিসের সৃষ্টি আছে, বিকাশ আছে এবং সেই পথেই তার অবলুপ্তির প্রশ্ন আছে। প্রত্যেকটি বিশেষ বস্তুর একটা গোড়া আছে, একটা শেষ আছে। আবার এই গোড়া ও শেষের ধারণাও আপেক্ষিক। অর্থাৎ বিশেষ একটা বস্তুকে ধরে তার গোড়া এবং শেষের ধারণা আমরা করতে পারি। ঠিক একইভাবে একজন বিশেষ মানুষের একটা বিশেষ অবস্থানকে ধরে তার সামনে বা পিছনের ধারণা আমরা অতি সহজেই করতে পারি। কিন্তু গোটা বস্তুজগতের গোড়া বা শেষ, অথবা সামনে বা পিছনের প্রশ্ন অবৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ গোটা বস্তুজগতের ক্ষেত্রেই যদি কেউ বলে, এর সৃষ্টি আছে, অবলুপ্তি আছে, তাহলে সে চিন্তা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তা। তার সাথে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটা পরিবর্তন। এই পরিবর্তনটা এদিকেও অসীম, ওদিকেও অসীম। অনেকে বলেছেন, এই পরিবর্তনের পিছনে চেতনার ভূমিকা আছে। আমি অবশ্য এই ধারণার সঙ্গে একমত নই। অনেকে আবার বলেছেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু পরিবর্তন। আর সমাজবিজ্ঞান, মানুষের প্রশ্ন যেখানে এসেছে সেখানে চেতনার ভূমিকা জড়িত, সেখানে গতিটা হচ্ছে অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড। এই ধারণার সঙ্গেও আমি একমত নই। বিষয়টা হচ্ছে, অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্টের একটা বিশ্বজনীনতা আছে। কিন্তু সেটা একটা বিশেষ এনটিটি-র (সত্ত্বার), একটা বিশেষ ঘটনার, একটা বিশেষ বস্তুর প্রপার্টি-র (ধর্মের) নিজ নিজ বিশেষ ধারায় অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্ট। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ঘটনা বা সত্ত্বার মধ্যে যে পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটছে সেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন বা গতির সাধারণীকৃত যে নির্বিশেষ প্রকৃতি তাকেই দর্শনের ভাষায় অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্ট বলা হয়। কিন্তু সমস্ত বস্তুজগতের ধারাবাহিক গতিকে যদি কোনও বিশেষ ধারায় একত্রে ধরে বলি অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্ট, তাহলে ভুল। এর ভুল হল, তাহলে এই পরিবর্তনের পিছনে একটা উদ্দেশ্য, একটা উদ্দেশ্যের ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হবে যেন একটা চেতনা, একটা উদ্দেশ্য এই গোটা জাগতিক বিবর্তনের পিছনে কাজ করছে, অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্টটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে বিশেষ একটা নিয়মে। এই হলেই আমরা ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যদিও বা বুঝি, প্রায়রিটি বুঝব না। কোনটা আগে কোনটা পরে বুঝব না। বুঝব না যে, ভাবের স্রষ্টা বস্তু, অর্থাৎ বস্তু থেকে ভাব সৃষ্টি হচ্ছে, বস্তু আগে ভাব পরে। তারপর তাদের ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে, একে অপরকে প্রভাবিত করছে। ফলে আমরা মাত্রা হারিয়ে ফেলব, ভাববাদে বিচ্যুত হব। তাহলে সমস্ত বস্তুর গোড়ার প্রশ্নটিই আবার ঘুরেফিরে আসবে। তাই অনওয়ার্ড অ্যান্ড আপওয়ার্ড ডেভেলাপমেন্ট এভাবে বুঝলে বা দেখলে চলবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও বলে যেতে চাই। আমরা ডেভেলাপিং ইউনিভার্স-এর (বিকাশশীল বিশ্বের) যে কথা বলি সেই ধারণা বা মতটা ঠিকই আছে। এর অর্থ হচ্ছে, আগে বহু জিনিস ছিল না, কিন্তু পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বহু নতুন জিনিস এসে গেছে। বিকাশশীল বিশ্ব বলতে এটাই বোঝানো হয়। এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স (সম্প্রসারণশীল বিশ্ব) বললে স্বাভাবিকভাবে যেটা চলে আসবে, তা হচ্ছে, বিশ্ব এখন যা আছে, আগে তার চেয়ে ছোট ছিল, তার আগে আরও ছোট ছিল, এভাবে যেতে যেতে গোটা বিশ্বের গোড়ার প্রশ্নটি এসে যেতে বাধ্য, যে ধারণা অবৈজ্ঞানিক এবং সেই অর্থে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। সেটা হল, আমরা যাকে নিয়ম বলি, যেমন সমাজ পরিবর্তনের যে নিয়মের কথা আমরা বলি, সেই নিয়মকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। বস্তুর পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় একটা নিয়ম অকার্যকরী হয়ে যায়, তার জায়গায় নতুন নিয়ম আবির্ভূত হয়। অবজেকটিভ ল ক্যাননট বি ডেস্ট্রয়েড অর অ্যাবলিশড। ইট কাম্‌স ইনটু অপারেশন ইন এ গিভ্‌ন কন্ডিশন অ্যান্ড গোজ আউট অব অপারেশন ইন অ্যানাদার কন্ডিশন, বিয়িং রিপ্লেসড বাই অ্যানাদার ল। ইট গোজ আউট অব দ্য সিন ইন্ডিং প্লেস টু এ ডিফারেন্ট ল। (বস্তুর নিয়ম কখনও ধ্বংস করা বা বাতিল করা যায় না। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়মটি ক্রিয়াশীল থাকে, আবার অন্য একটি পরিস্থিতিতে সেই বিশেষ নিয়মটি ক্রিয়াশীল থাকে না, নতুন

নিয়ম তার জায়গা নেয়। নতুন নিয়মকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুরনো নিয়মটি চলে যায়)। আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে, এই যে বিশ্বজগৎ, এই যে গোটা দুনিয়া, বা আমাদের সমাজ, বা বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা — যাই কিছু বলি, কোনও কিছুই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে নেই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজে আদর্শ, রীতিনীতি সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই পরিবর্তনের কারণ কী ? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলছে, সব কিছুর মধ্যেই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব রয়েছে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বই পরিবর্তনের কারণ। যে সমস্ত শক্তি দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তাদের মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা যায় — একটা থিসিস আর একটা অ্যান্টি-থিসিস। একটা শক্তি বিদ্যমান কাঠামোটিকে টিকিয়ে রাখতে চায়, আর একটা সেই কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তাকে ভাঙতে চায়।

পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বহির্দ্বন্দ্ব তাকে প্রভাবিত করে

দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে মাও সে-তুঙের এক অপূর্ব আলোচনা আছে। মাও সে-তুঙ বলেছেন, পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর বর্হির্দ্বন্দ্ব তাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং মেটাফিজিকসে যে ধারণা ছিল, বাইরের একটা শক্তি বস্তুকে গতিশীল করেছে, সেটা ভুল। অ্যাবসোলিউট রেস্ট (পরিপূর্ণ স্থির বা গতিহীন) বলে কিছু নেই। সব কিছুই গতিশীল। বাইরের শক্তি বস্তুর গতির অবস্থা পরিবর্তন করতে চায়। আমরা বিজ্ঞানের আলোচনাতেও দেখেছি, গতির কারণ ভিতরে, বাইরে নয়। নিউটোনিয়ান মেকানিকসের সেই পুরনো ধারণা আজ পাল্টে গেছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের ভূমিকাকে বোঝবার জন্য আমি দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন, একটা কারবাইড গ্যাসের বাতি। দেশলাই না হলে বা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে আগুন দিয়ে বাতিটা না ধরালে বাতিটা জ্বলে না। এটা দেখে কেউ বলতে পারেন, দেশলাই বা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে না জ্বালালে যেহেতু গ্যাসটা জ্বলে না, সেখানে বহির্দ্বন্দ্ব পরিবর্তনের মূল কারণ হবে না কেন? হবে না এই কারণে যে, বাতিটার মধ্যে কারবাইডের গ্যাসটাই যদি না থাকে, বা এমন কিছু না থাকে যেটা দাহ্য, তাহলে বাইরে থেকে দেশলাইয়ের পর দেশলাই জ্বালালেও বাতি জ্বলবে না। সুতরাং অন্তর্দ্বন্দ্বই হচ্ছে পরিবর্তনের মূল কারণ।

আবার দেখুন, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদে বলা হয়, কোনও দেশে বিপ্লব আমদানি বা রপ্তানি করা চলে না। অন্তর্দ্বন্দ্বই যে পরিবর্তনের মূল কারণ, এটা ভাল করে বুঝলে সকলেই বুঝতে পারবেন কথাটা কত সত্য। কোনও দেশে যদি বিপ্লবের অনুকূল আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি তৈরি না থাকে, যদি তা পরিণত না হয়, তখন বাইরের থেকে বিপ্লবের কোনও শক্তি যত চেষ্টাই করুক না কেন সেখানে বিপ্লব হবে না। বাইরের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব নিশ্চয়ই সেদেশের বিপ্লবী আন্দোলনে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে, কিন্তু কিছুতেই বিপ্লবটা ঘটিয়ে দিতে পারে না। সে কারণেই বলা হয়, কোনও দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি না হলে সেদেশে বিপ্লব হবে না। বিপ্লব সফল করতে হলে, বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবজেকটিভ এবং সাবজেকটিভ কন্ডিশন — দুটোই প্রস্তুত থাকতে হবে।

বহির্দ্বন্দ্বকে পরিবর্তনের মূল কারণ বলা হবে না কেন তার উদাহরণ হিসাবে তাঁরা বলেন, এরকম ঘটনা তো আমরা দেখি যে, দলের সাথে যুক্ত হল এমন একজন কমরেড নেতার সংস্পর্শে এসে একেবারে পাল্টে গেল। তার চেহারাটাই পাল্টে গেল। ভাল কর্মী হল, আরও ভাল কর্মী হওয়ার সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করল। এর পরেও কি একথা বলা ভুল যে, এক্ষেত্রে বহির্দ্বন্দ্ব পরিবর্তনের মূল কারণ হিসাবে কাজ করল ? আসলে বাইরে থেকে দেখলে বা উপর উপর দেখলে অনেকের এরকম ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু বিষয়টাকে আরও গভীরে বুঝতে হবে। নেতার সংস্পর্শে এসে একজন একেবারে পাল্টে গেল, এরকম ঘটনা সেই কর্মীর ক্ষেত্রেই ঘটে যার নিজের মধ্যেই সেই সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল। কোনও কর্মীর ভিতরে সেই সম্ভাবনা বা উপাদান না থাকলে এই পরিবর্তন ঘটতে পারে না। উপাদান না থাকলে সেটা কি বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায়? না, যায় না। লক্ষ করতে হবে, এক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ শক্তিটাকে চূড়ান্তভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐ বাইরের শক্তিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এটা ঠিক। কিন্তু কর্মীটির মধ্যে সেই সম্ভাবনা না থাকলে এবং সেই কর্মীটির নিজস্ব সংগ্রাম না থাকলে শুধু নেতার চেষ্টায় এটা হত না। তাছাড়া পরিবর্তন যখন ঘটল তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিবর্তন ঘটল বলেই কর্মীটিও পরিবর্তিত হল, অর্থাৎ বহির্দ্বন্দ্বটা

কাজ করল অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আর একটি দিক থেকে বিষয়টিকে বিচার করুন। নেতার সংস্পর্শে তো অনেক কমরেড এসেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং সাহায্যও পেয়েছেন। কিন্তু দেখা গেল, কিছু কর্মীর ক্ষেত্রে নেতার প্রভাব খুব ভালভাবেই ঘটল যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটল না। এটা হল কেন? এটা এই কারণেই হল যে, প্রথমোক্ত কর্মীদের জীবনে যে ভিতরকার সংগ্রাম তাদের বিপ্লবী চরিত্র অর্জন সম্ভব করে তুলল, সেই ভিতরকার সংগ্রামটা অন্য কর্মীরা ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারলেন না। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাঁরা নানা দুর্বলতার সাথে আপস করলেন। তাই তাঁরা তেমনভাবে এগিয়ে আসতে পারলেন না।

মিলনাত্মক ও বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের অবস্থান আপেক্ষিক

দ্বন্দ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার আরও বহু দিক আছে। তার মধ্যে আর একটা দিক হচ্ছে এই যে, সমস্ত দ্বন্দ্বকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হল বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব, আর একটা হল মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব। বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি কী? বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি হচ্ছে, একে অপরকে খতম করে, ধ্বংস করে, যেটা আপসহীন। যেমন ধরুন, শত্রুর সঙ্গে লড়াই। এই লড়াই এমন যে, শত্রুর সঙ্গে আপস করে আপনি বাঁচতে পারবেন না। সে বেঁচে থাকলে হয় আপনি শেষ, নাহয় আপনি বেঁচে থাকলে সে শেষ। এই যে লড়াই, এই লড়াইয়ের প্রকৃতি হল আপসহীন। যেমন শ্রম এবং পুঁজির দ্বন্দ্ব। ঐতিহাসিকভাবেই এর অবস্থান এমন যে, মালিকী শাসনব্যবস্থাকে না ভাঙলে, মালিকের মুনাফার চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে মজুর মুক্তি অর্জন করতে পারে না। এ লড়াইতে জেতার মধ্যেই রয়েছে মজুরের মুক্তি। সুতরাং এ ধরনের যে দ্বন্দ্ব তাকে বলা হয় বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব।

আর মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব বলতে কী বোঝানো হয়? এ দ্বন্দ্বও দ্বন্দ্ব, কিন্তু যে দু'টি শক্তি এই দ্বন্দ্বে লিপ্ত, শেষপর্যন্ত তারা একই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। যেমন এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মূল শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, একদিকে মজুর অন্যদিকে মালিক। আবার এই মজুরশ্রেণীর মধ্যেও রয়েছে নানা ধরনের পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব। কলকারখানার মজুর অর্থাৎ শিল্পশ্রমিক, গ্রামের চাষীর ঘর থেকে আসা মজুর, আবার মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যারা মজুরে পরিণত হয়েছেন সেই মজুর। সকলেই মজুর হওয়া সত্ত্বেও চিন্তাভাবনা, মানসিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দেখা দেয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের চরিত্র এমন নয় যে, একে অপরকে উচ্ছেদ করতে চায়। মালিকের বিরুদ্ধে, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের মধ্যে মূলগত ঐক্য আছে। সুতরাং এদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যাই থাকুক না কেন, ইন রিলেশন টু প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অর দি এগজিসটিং এক্সপ্লয়টেটিভ সিস্টেম দে আর অল ইউনাইটেড (উৎপাদন এবং বণ্টন অথবা প্রচলিত শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধ)। সুতরাং মজুরশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তাকে বলা হয় মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব। আবার একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে যে দ্বন্দ্বের রূপ বিরোধাত্মক বা যেটা বিরোধাত্মক রূপ নিয়ে অবস্থান করে, এমন ঘটনাও ঘটে যে, একেবারে ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক দ্বন্দ্বের রূপ নিল। চীনবিপ্লবের একটা পর্যায়ে যখন চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে পরিচালিত কুওমিংটাঙের বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী লড়াই শুরু করেছিল তখন সে দ্বন্দ্বের রূপ ছিল সন্দেহাতীতভাবে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব। কিন্তু চীন যখন জাপানি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হল তখন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে রোখাই ছিল কমিউনিস্টদের প্রথম এবং প্রধান কাজ। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তখন সঠিকভাবেই সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে জাপানি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে চিয়াং-এর সাথে ঐক্য গড়ে তুলল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই সংগ্রামকে এমনভাবে পরিচালিত করেছে যার মধ্য দিয়ে জাপানের হাত থেকে চীনকে মুক্ত করার সাথে সাথে চিয়াংকেও এগজস্ট (নিঃশেষিত) করেছে। দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে চীন দেশের বিপ্লবী আন্দোলন যেভাবে শক্তি অর্জন করেছিল, সেসব কথা ইতিহাসে লেখা আছে।

আবার অন্য দিক থেকে দ্বন্দ্বের রূপ যখন মিলনাত্মক, অর্থাৎ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে সুদৃঢ় করাই হচ্ছে যেখানে মূল লক্ষ্য, তখনও আবার মূল কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে যদি আলাদা এলিমেন্ট অব কন্ট্রাডিকশন (দ্বন্দ্বের উপাদান) হিসেবে বিচার করা হয়, তাহলে দেখতে পাব, সেখানে দ্বন্দ্বের রূপ

বিরোধাত্মক। একটি শ্রমিকশ্রেণীর দলের অভ্যন্তরে নানা বিষয় নিয়ে নানা কারণে যে মতপার্থক্য দেখা দেয় সেই মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্বের রূপ হল মিলনাত্মক, অর্থাৎ আলাপ-আলোচনা এবং মত বিনিময়ের মধ্য দিয়েই মতপার্থক্যগুলোকে নিষ্পত্তি করা হয় এবং সেই মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি আরও শক্তিশালী হয়। কিন্তু যে কোনও প্রশ্নে মতপার্থক্যের বিষয়টিকে যদি আলাদা একটা দ্বন্দ্বের উপাদান হিসাবে দেখা হয় যেটা আসলে ঠিক-বেঠিকের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হল কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, এটা স্থির করা — বা হতে পারে দুটোর মধ্যে কোনটাই ঠিক নয়, তৃতীয় কোনও চিন্তা সঠিক— সেক্ষেত্রে আলাদা করে সেই দ্বন্দ্বের উপাদানের চরিত্র নিশ্চয়ই বিরোধাত্মক ছাড়া কিছু নয়। আবার এই ঠিক-বেঠিকের দ্বন্দ্ব যা মূল কাঠামোর বিচারে মিলনাত্মক, পরিবর্তিত অবস্থায় তা বিরোধাত্মক রূপ নিতে পারে। তখন প্রয়োজন, ভুলকে হঠিয়ে যা ঠিক তা প্রতিষ্ঠিত করা।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, দ্বন্দ্বের দুটো রূপ বা চরিত্র রয়েছে — বিরোধাত্মক এবং মিলনাত্মক। এখন এই বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের আপেক্ষিক অবস্থানকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। দেশে দেশে বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী ও সমস্ত রকম শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন উচ্ছেদ হয়ে যাবে, যখন সমাজতন্ত্রের স্তর অতিক্রম করে সাম্যবাদে পৌঁছে যাবে সমাজ, যখন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন উৎপাদন ও বণ্টনকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিরোধও থাকবে না। তখন উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব, যেটাই বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল এবং বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। দ্বন্দ্বের এই যে বিশেষ বিরোধাত্মক রূপ, এই বিশেষ বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকবে না, তার অবসান ঘটবে। তাই লেনিন বলেছেন, “অ্যান্টাগনিজম অ্যান্ড কন্ট্রাডিকশন আর নট অ্যাট অল ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম। আন্ডার সোস্যালিজম দ্য ফার্স্ট উইল ডিসঅ্যাপিয়ার, দ্য সেকেন্ড উইল রিমেইন।” (দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ এই দুটো কখনই এক নয়। সমাজতন্ত্রে প্রথমটা অন্তর্হিত হবে, দ্বিতীয়টা থাকবে। — নির্বাচিত রচনাবলী, রাশিয়ান সংস্করণ, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪৩১। মাও সে-তুঙের ‘অন কন্ট্রাডিকশন’ পুস্তকে উদ্ধৃত পৃঃ ৩৫৭)। আর মাও সে-তুঙ বলেছেন, “অ্যান্টাগনিজম ইজ ওয়ান ফর্ম, বাট নট দি ওনলি ফর্ম অব দ্য স্ট্রাগল অব অপোজিট্স; দ্য ফর্মূলা অব অ্যান্টাগনিজম ক্যাননট বি আরবিট্রারিলি অ্যাপ্লায়েড এভরিহোয়্যার।” (দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের একটা রূপ হচ্ছে বিরোধ, কিন্তু তা একমাত্র রূপ নয়; বিরোধের ফর্মূলাকে খেয়ালখুশিমত সর্বত্র প্রয়োগ করা যায় না। — ‘অন কন্ট্রাডিকশন’, মাও সে-তুং)।

পুঁজিবাদী সমাজের উদাহরণকে সামনে রেখে যদি আমরা বিচার করি, তবে তার পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে প্রথমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন এবং সেই স্তরকে উত্তীর্ণ করে শ্রেণীহীন সমাজ পত্তনের মধ্য দিয়ে যেহেতু এই বিশেষ দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব তার অবসান ঘটে — সেই অর্থে সেটাকে সাময়িক বলা হয়। এভাবে বলার মধ্যে কোনও ভুল নেই। কিন্তু লেনিন বা মাও-এর এই বক্তব্যকে সর্বজনীন করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কেননা আমরা যখন বলি দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব অবস্থান করছে মানেই হল সে অ্যান্টাগনিজম (বিরোধ) এবং নন-অ্যান্টাগনিজম (মিলন) দুটো নিয়েই অবস্থান করছে। সুতরাং সাধারণ অর্থে একথা বলা ভুল হবে যে, অ্যান্টাগনিজম ইজ টেম্পোরারি, কন্ট্রাডিকশন ইজ পার্মানেন্ট (বিরোধ হচ্ছে সাময়িক, দ্বন্দ্ব হচ্ছে স্থায়ী)। আবার একথাও খেয়াল রাখতে হবে, দ্বন্দ্বের মধ্যে বিরোধ এবং মিলন এই দুটোই অবস্থান করছে ইউনিভার্সালিটি অ্যান্ড পার্টিকুলারিটি অব কন্ট্রাডিকশন-এর (দ্বন্দ্বের সর্বজনীন এবং বিশেষ রূপের) মধ্যেই। অর্থাৎ বস্তুময় এই জগতে এমন কোনও বস্তুসত্তা নেই যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, ঘাত-প্রতিঘাত নেই। দ্বন্দ্বের এই সর্বজনীন চরিত্রের ক্ষেত্রে সর্বত্র যেমন বিরোধ এবং মিলন নিয়ে দ্বন্দ্ব অবস্থান করে, আবার আমরা যখন আলাদা করে বিশেষ বস্তুর বিশেষ দ্বন্দ্বকে দেখতে চাই সেখানেও সেই দ্বন্দ্ব পারিপার্শ্বিকের সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিরোধ এবং মিলন রূপে অবস্থান করে।

আমরা এই যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব আলোচনা করছি সেটা এজন্য নয় যে, কিছু তত্ত্ব জেনে রাখলাম। আমাদের জানবার উদ্দেশ্য হল, সচেতনভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে জানা। সুতরাং আমাদের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সাধারণভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে, একথা ঠিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেন জানছি, কী উদ্দেশ্যে জানছি, সেটাই হল আসল। দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি কী, এটা বই পড়ে জানা যায় বা বোঝা যায়। কিন্তু তাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে

সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সমস্ত জীবন লেগে যায়। আমাদের প্রতিমুহূর্তে বিচার করে দেখতে হবে, দ্বন্দ্বতত্ত্বকে জেনে সেই অনুযায়ী বিশেষ কোনও ঘটনার উপর আমরা সচেতনভাবে ক্রিয়া করতে পারছি কি? সেই ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারছি কি? একটা সংগঠনকে চালাতে পারছি কি? একটা মানুষকে বোঝাতে পারছি কি? মানুষের কোনও সমস্যার যথার্থ সমাধান করতে পারছি কি? কোনও বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে পারছি কি? সুতরাং দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাধারণ তত্ত্বকে যদি বাস্তবে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমরা জ্ঞানের রূপে পার্টিকুলারাইজ (বিশেষীকৃত) করতে না পারি তাহলে বুঝতে হবে, এত কিছু জানা সত্ত্বেও আমরা সব অকম্মার ঢেঁকি। আমাদের সব কিছু জানা হল বুকিশ, অর্থাৎ শুধু বই পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা একেবারে অকার্যকর। দ্বন্দ্বতত্ত্বকে এভাবে জানলে সেটা আমাদের সাহায্য করবে না। মানুষকে বোঝানো, সংগঠন গড়া, আন্দোলন পরিচালনা করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে গাইড (পরিচালনা) করা, এসব ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বতত্ত্বের কী প্রাসঙ্গিকতা সেগুলোই আমাদের ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল তিনটি নিয়ম

এবার মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের থ্রি প্রিন্সিপলস (তিনটি নীতি) নিয়ে কয়েকটি কথা বলব। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বস্তুজগতের সমস্ত কিছুর পরিবর্তনের মধ্যেই এই তিনটি নীতি কাজ করছে। বিষয়টা এমন নয় যে, আমরা বলছি বলেই বস্তুর পরিবর্তনগুলো এই তিনটি নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যে কোনও বস্তু, সমাজ, বা যে কোনও পরিবর্তনের কথাই বলি না কেন, সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই এই তিনটি নীতি কাজ করছে, তাদের প্রভাবিত করছে। এই তিনটি নীতি কী কী ? এর প্রথম নীতিটি হল ঃ ফ্রম কোয়ানটিটেটিভ চেঞ্জ টু কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অ্যান্ড ভাইসি-ভার্সা (পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং ভাইসি-ভার্সা)।

দ্বিতীয়টি ঃ ইউনিটি অব অপোজিটস্ (দুই বিরোধী শক্তির ঐক্য)।

তৃতীয়টি ঃ নিগেশন অব নিগেশন, (বিকাশের পথে অবলুপ্তি, অবলুপ্তির পথে বিকাশ)।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং ভাইসি-ভার্সা

ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদে এঙ্গেলসকে দেখেছি, তিনি শুধু পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন বলেই থামেননি, তিনি ভাইসি-ভার্সাও বলেছেন। আবার কেউ কেউ ভাইসি-ভার্সার কথা উল্লেখই করেননি। আমি আলোচনা করে দেখাব, ভাইসি-ভার্সার ধারণাটা কত জরুরি, যে কারণে এই ধারণা বাদ দেওয়ার কোনও প্রশ্ন আসে না। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং ভাইসি-ভার্সা না বললে ধারণাটা সম্পূর্ণ হয় না। যাই হোক, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন বলতে আমরা কী বুঝি? এই নীতিটিকে অন্য কথাতেও বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন, গ্র্যাজুয়াল টু অ্যাবরাপ্ট চেঞ্জ, ইভলিউশনারি টু রেভলিউশনারি চেঞ্জ (ধীরে ধীরে পরিবর্তন থেকে হঠাৎ পরিবর্তন, ক্রমপরিবর্তন থেকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন)। আবার বিজ্ঞানে বলা হয়, কন্টিনিউয়াস টু ডিসকন্টিনিউয়াস চেঞ্জ (ধারাবাহিক পরিবর্তন থেকে ছেদযুক্ত পরিবর্তন)।

ধরুন, এক বাটি জলে তাপ দেওয়া শুরু হল। পুরো জলটা বাষ্প হওয়ার আগে জলটা প্রথমে গরম হল, তারপর ফুটন্ত হল এবং শেষপর্যন্ত পুরো জলটাই বাষ্পীভূত হল। পুরো জলটা বাষ্প হওয়ার আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুধু পরিমাণগত পরিবর্তন হচ্ছে। কোন অর্থে পরিমাণগত পরিবর্তন হচ্ছে? না, তাপের পরিমাণ বা উষ্ণতা বেড়ে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরো জলটা বাষ্পীভূত হচ্ছে না যতক্ষণ পর্যন্ত না জলের তাপমাত্রা সাধারণ চাপে ১০০° সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছায়। একথা সকলেই জানেন। তাহলে জলটা যখন প্রথমে গরম করা শুরু হল তখন পরিবর্তনটা হতে শুরু করল ধীরে ধীরে। তারপর ১০০° সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছান মাত্রই জলটা আর তরল অবস্থায় থাকল না, বাষ্পীভূত হয়ে পড়ল। এই যে জলটা বাষ্পীভূত হল সে অবস্থায় গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে, একথা বলা হচ্ছে কেন? কারণ জলটা আর জল নেই, সে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তরল অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে সে বাষ্পীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। গুণগত পরিবর্তনকে এই অর্থে এবং এতটুকুই বুঝতে হবে। এর বেশি কিছু নয়। কেন না কেমিক্যাল প্রপার্টি (রাসায়নিক গুণ) যদি বলি, তাহলে

ছাত্ররা জানেন যে, জল ও বাষ্পের রাসায়নিক চরিত্রের মধ্যে সাধারণত বিশেষ কোনও ফারাক নেই। সুতরাং গুণগত পরিবর্তন বলতে রাসায়নিক বা অন্য কোনও গুণগত পরিবর্তনের কথা এখানে বলা হচ্ছে না।

আবার ধরুন, আমাদের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে এই পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। শ্রমিকশ্রেণী মুক্তিবেদনায় ছটফট করছে। সমাজ অভ্যন্তরে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে। মার্কসবাদ বলে, যে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদ ভেঙে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করবে, যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজকে পাল্টাবে, সেই শ্রমিককে নিজেকে আগে পাল্টাতে হবে। কারণ বর্তমান সমাজে শ্রমিকরা পুঁজিবাদী ধ্যানধারণা ও কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। এই ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় চরিত্রকে প্রথমে পরিবর্তন করতে হবে। এ কাজ যে করতে পারল সেই শ্রমিকই কমিউনিস্ট। এটা একটা গুণগত পরিবর্তন। তাই শ্রমিক মানেই কমিউনিস্ট নয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যখন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছে, তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক পার্টি তথা সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠছে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি প্রধান শক্তিতে পরিণত হচ্ছে, সবকিছুর ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রমিক আন্দোলন একটা চেতনার ভিত্তিতেই শক্তিশালী হচ্ছে। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে যেটা ঘটছে, তাহল, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিমাণগত পরিবর্তন হচ্ছে।

বিষয়টিকে আমি আর একটি দিক থেকে দেখতে বলছি। ধরুন, পরিস্থিতিটা এমন যে, দেশে শ্রমিক আন্দোলন যা হচ্ছে সেটা শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনা, গভীর উপলব্ধি এবং চিন্তার স্বচ্ছতা গড়ে তুলতে পারছে না। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি দেখে কেউ যদি মনে করেন, মজুর-মালিকের দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে না, তাহলে ভুল হবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্বলতা দেখে এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছালে ভুল হবে এই কারণে যে, বাস্তব ঘটনা তা নয়। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, ক্রমাগত পোলারাইজশন অ্যামং দ্য ক্লাসেস (শ্রেণীগুলির মেরুকরণ) বাড়ছে এবং এই কারণে ক্লাসেস আর এনগেজড ইন এ লাইফ অ্যান্ড ডেথ স্ট্রাগল এগেনস্ট ইচ আদার (শ্রেণীগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে)। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার জন্য, মতবাদিক সংগ্রামের দুর্বলতার জন্য এবং শোধনবাদী বা বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলির প্রভাবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা গড়ে উঠতে পারছে না। এরকম ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু চিন্তাগত বা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নানা কারণে দুর্বলতা দেখা দিলেও, একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, পুঁজিবাদ যত ক্ষয়িষ্ণু ও মরণোন্মুখ হচ্ছে, শোষিত মানুষ ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর তার আক্রমণ তত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং সেই কারণে পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী আরও বেশি করে জীবনমরণ সংগ্রামের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। আর দুই শ্রেণীর এই পরস্পরবিরোধী সংগ্রামের প্রতিফলন শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই ঘটতে বাধ্য। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে এই সংগ্রাম নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলা সত্ত্বেও এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল তবিয়তেই রয়ে গেছে। এর থেকে একটা কথা খুবই পরিষ্কার। তা হচ্ছে এই যে, পরিবর্তন যেটা ঘটে চলেছে প্রতিমুহূর্তে, শুধু সেই পরিবর্তনের ফলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয়ে যাবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ তখনই সম্ভব হবে, যখন শুধু বাস্তব পরিস্থিতি বা অবজেকটিভ কন্ডিশনই নয়, যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্ব সাবজেকটিভ কন্ডিশন অর্থাৎ আদর্শগত ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত শক্তি নিয়ে উপস্থিত হবে। একমাত্র তখনই বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তন করা সম্ভব হবে। তার আগে নয়। সুতরাং সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই নীতিটি কেমনভাবে কাজ করে সেটাও সকলকে বারবার ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

ভাইসি-ভার্সার ধারণাটি অত্যন্ত জরুরি

ভাইসি-ভার্সা বলে যে কথাটা এক্ষেত্রে বলা হয়েছে, সেটা বাংলায় 'তদ্বিপরীতে' বা 'বিপরীতক্রমে' কথাটা যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই অর্থে একেবারেই বলা হয়নি। তাহলে এক্ষেত্রে ভাইসি-ভার্সা কথাটার মানে কী? প্রথমত, আমরা আগেই আলোচনা করে দেখেছি, একটি বিশেষ বস্তুর পরিমাণগত থেকে গুণগত পরিবর্তন কথাটা যে আমরা বলি সেটা এই অর্থেই বলি যে, যতক্ষণ না বস্তুটার মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে ততক্ষণ বস্তুটার গুণগত পরিবর্তন হয় না, সেটা পরিমাণগত পরিবর্তনই থেকে যায়। কিন্তু এই যে পরিমাণগত

পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বিকাশের পথে শেষপর্যন্ত গুণগত পরিবর্তনটা ঘটছে, এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বহু পরিমাণগত-গুণগত'র ইন্টার ডায়ালেকটিক্যাল কনফ্লিক্ট (আন্তর্দ্বন্দ্বমূলক সংঘাত) হচ্ছে। অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে হলেও তার মধ্যে কিছুটা গুণগত পরিবর্তনও ঘটছে এবং যতটুকু গুণগত পরিবর্তন ঘটছে সেটা আবার তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পরিমাণগত পরিবর্তনকে কিছুটা ত্বরান্বিত করছে। যেমন ধরুন জল। যখন তাপ দিতে থাকবেন, ১০০° সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছে পাত্রের পুরো জলটা একসঙ্গে বাষ্প হওয়ার আগেই বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে যায়। পাত্রের মধ্যে সমস্ত জলটা একই সঙ্গে ১০০° সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছায় না। কোনও কোনও বিন্দুতে যেখানে যেখানে ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তৈরি হয় সেখানে সেখানে জল একটু একটু করে বাষ্প হয়, তরল জলের পরিমাণটাও একটু একটু করে কমতে থাকে। পরিমাণ একটু একটু করে কমছে, একটু একটু করে বাষ্প উপরে উঠে যাচ্ছে, সেই অনুপাতে তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে পুরো জলটাই ১০০° সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছে বাষ্প হচ্ছে। অর্থাৎ যাকে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বলা হয় যদি সেখান থেকে ধরি, সেখান থেকে শুরু করবার পর ১০০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত যে পর্যায়টা সেখানেও কিন্তু পুরো জল একসঙ্গে বাষ্পীভূত না হলেও একটু একটু পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হতে থাকে। আর যেমন যেমন একটু একটু করে জল বাষ্পীভূত হচ্ছে তেমন তেমন করে জলের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ একটু একটু করে গুণগত পরিবর্তন ঘটার প্রক্রিয়ায় পরিমাণগত পরিবর্তনও ত্বরান্বিত হচ্ছে। এটাকেই বুঝতে হবে ভাইসি-ভার্সা হিসাবে। অর্থাৎ জলের তাপমাত্রা যেমন বৃদ্ধি পায় যাকে পরিমাণগত পরিবর্তন বলা হয়, সেই পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই সমস্ত জল ১০০° সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছানোর আগেই কিছু কিছু জলবিন্দুর ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। আর বিশেষ বিশেষ জলবিন্দুগুলো এইভাবে যেমন যেমন বাষ্পীভূত হয় সেটা আবার জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি তথা পরিমাণগত পরিবর্তনকে দ্রুত করতে সাহায্য করে। ভাইসি-ভার্সা বিষয়টা যাঁরা এইভাবে বোঝেন না তাঁরা দলের মধ্যেও বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবার জন্য কমরেডদের যে গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ডের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেটা ধরতে পারেন না। এসব দিকগুলোর গুরুত্ব তাঁরা বাস্তবে কম দেন।

দলের ক্ষেত্রে ভাইসি-ভার্সা নীতিকে আমরা কীভাবে বুঝব ? আমরা দেখছি, দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ছে, অর্থাৎ দলের পরিমাণগত দিক বেড়ে চলেছে। কিন্তু দলের এই পরিমাণগত দিক বাড়াকে ভিত্তি করে যদি আমরা মনে করি, এই পথেই আপন নিয়মে অটোমেটিক্যালি দলের নেতা-কর্মীদের গুণগত দিকটাও বৃদ্ধি পাবে, তাহলে সেই বোঝাটা ভুল হবে। কারণ এইভাবে মনে করার মধ্যে ভাইসি-ভার্সার বিষয়টাকে ধরা হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা ভাইসি-ভার্সা বোঝেন, পরিমাণগত-গুণগত'র আন্তর্দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বোঝেন এবং পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে যে কিছুটা হলেও গুণগত পরিবর্তন ঘটে বা ঘটাতে হয় যেটা পরিমাণগত পরিবর্তনকে দ্রুত করে, প্রভাবিত করে এবং এই পরিবর্তন যে আপন-নিয়মে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় হয় না, এসবই একই সাথে যাঁরা ধরতে পারেন তাঁরাই পার্টির অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের গুণগত মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করার গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতার পথেই একদিন সুদূর ভবিষ্যতে যখন বিশ্বসাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার পত্তন হবে তখন সেই সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে সমস্ত মানুষগুলো স্বাভাবিকভাবে কমিউনিস্ট হওয়ার এবং উন্নত কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রামে যে লিপ্ত থাকবে সেটা তত্ত্বগতভাবে আমরা একরকম বুঝতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা জবরদস্তভাবে বহাল থাকা সত্ত্বেও সেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে দেশে দেশে যাঁরা কমিউনিস্ট হিসাবে বেরিয়ে আসছেন সেটা ঘটছে কী করে? মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ থেকে শুরু করে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা মরণপণ সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করছেন সেটা ঘটছে কী করে? এটা ঘটে এজন্যই যে, গোটা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাইসি-ভার্সার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে। এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় একটি একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী যেমনভাবে বেরিয়ে আসবেন, ঠিক তেমনভাবেই পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলনের পরিমাণগত পরিবর্তনও ঘটতে থাকবে। এই প্রক্রিয়াটা চলতে চলতে ভবিষ্যতে অবজেকটিভ এবং সাবজেকটিভ কন্ডিশন পরিণত হবার মধ্য দিয়েই বিপ্লবের মুহূর্ত উপস্থিত হবে।

বিরোধের মধ্যে ঐক্য, ঐক্যের মধ্যে বিরোধ

তিনটি মূল নীতির আর একটি নীতি হচ্ছে দুটো বিরোধী শক্তির সমন্বয় বা ঐক্য। ধরুন শ্রম এবং পুঁজির দ্বন্দ্ব। মার্কসবাদী মাত্রেই জানেন, আমাদের দেশের শ্রমিকদের মুক্তি নিহিত আছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং উৎপাদন যন্ত্রের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই লড়াই-ই হচ্ছে তাদের মুক্তির লড়াই। এ লড়াই আপসহীন লড়াই। এই লড়াইয়ের মীমাংসা যতদিন না হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ততদিন চলতে থাকবে। কিন্তু এই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে লড়াইয়ের মধ্যেও মালিকদের সঙ্গে হাজার একটা আপসে যেতে হবে। এই আপসের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে। শ্রমিকের সংগ্রামের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে তাকে বারবার এই আপস করতে হচ্ছে। কিন্তু এই আপস কোনওমতেই সংগ্রামের লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে নয়। আবার দেখুন, এই যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটা টিকে আছে, এটা টিকে আছে কীসের ভিত্তিতে ? যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে শ্রমিকের লক্ষ্য সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই কিন্তু টিকে আছে মালিক-মজুরের সহযোগিতার ভিত্তিতে। সমাজে যে উৎপাদন আমরা দেখছি, শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছাড়া কি সে উৎপাদন হতে পারত? সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন হত প্রধানত নিজেদের ভোগের জন্য, আর বাকিটা বিনিময়ের মাধ্যমে জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী জোগাড় করবার জন্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে এসে সেটা পাল্টে গেল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে শ্রমিক সে কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক নয়, কেননা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা রয়েছে কলকারখানার মালিকের হাতে। অথচ উৎপাদিত দ্রব্যের চরিত্র হচ্ছে সামাজিক। এই অর্থে সামাজিক যে, ব্যক্তিগত ভোগের উদ্দেশ্যে এই উৎপাদন হচ্ছে না, হচ্ছে সামাজিক চাহিদা মেটাবার জন্য। কিন্তু মালিকানা হচ্ছে প্রধানত ব্যক্তিগত। একে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল দ্বন্দ্ব।

একথা বুঝতে হবে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকরা চাইলেই এই রাষ্ট্রকাঠামোকে ইচ্ছামতো উচ্ছেদ করতে পারে না। তার জন্য প্রস্তুতি চাই, প্রয়োজনীয় শক্তি চাই। সেই শক্তির কাছাকাছিও আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন এখনও পৌঁছতে পারেনি। এই মালিকী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব — শুধু এটুকু বুঝে যদি অসংঘবদ্ধ, রাজনৈতিক দিক থেকে অসচেতন শ্রমিক শেষ বা চূড়ান্ত লড়াইয়ের কথা ভাবেন, যদি সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর দলের নেতৃত্ব উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে গড়ে ওঠার আগেই শুধু ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রমিকরা আঘাত হানার কথা ভাবেন, তাহলে রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়নমূলক আক্রমণের আঘাতে দু'দিনেই সে আন্দোলন ছত্রখান হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদী সমাজে যখন কোনও দাবির ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে তখন বুর্জোয়াশ্রেণী চায় যাতে সে আন্দোলন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নিতে না পারে, সচেতন, সংঘবদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে না পারে। স্বতঃস্ফূর্ত, বিস্ফোরণমূলক আন্দোলনে তারা ভয় পায় না। তাদের ভয় হচ্ছে সচেতন, সংঘবদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনকে, যে আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে করতে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দিতে পারে রাষ্ট্রের বিকল্প শক্তি হিসাবে।

নকশালপন্থী* বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরা দুই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতিকে বুঝতে না পেরে এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। আমরা তাঁদের আত্মত্যাগকে খুবই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কিন্তু ক্ষতি যেটা হওয়ার তা তো হয়েছেই। কড়ায়-ক্রান্তিতে তার মাশুল আজও দিতে হচ্ছে। কোয়ার্সিভ স্টেট অ্যাপারেটাস-এর (দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের) আক্রমণের আঘাতে এইসব আন্দোলন যে শুধু চুরমার হয়েছে তাই নয়, নেমে এসেছে একটা হতাশা। এই হতাশাটা হল বাড়তি ক্ষতি। দুই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতি না বুঝলে বিপ্লবী আন্দোলনের নানা টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন-এর (আঁকাবাঁকা পথ বা উত্থান-পতনের) মধ্যে আন্দোলনকে রক্ষা করা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আঘাত করার মতো উপযুক্ত শক্তি যতক্ষণ সৃষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ দুই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতি মেনে চলতে হবে। কিন্তু যখন সেই বিপ্লবের মুহূর্ত উপস্থিত হয় তখন যদি কেউ বিরোধের মধ্যে ঐক্যের নাম করে বিপ্লবী আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেন তাহলে সেটাকেও রুখতে হবে। এই নীতির উপলব্ধিটা এরকম নয় যে, এই দুটো বিরোধী শক্তি চিরকালই অবস্থান করবে এবং চিরকালই এই দুটো শক্তির ঐক্যও থাকবে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আঘাত

* পরবর্তীকালে তারা সি পি আই (এম-এল) নামে বিভিন্ন পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

করা চলবে না। দুই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতির এরকম ধারণা মার্কসবাদসম্মত নয়।

দুই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতি সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা দরকার। আমাদের বুঝতে হবে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি নীতিই একই সাথে কাজ করে। এরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সেই কারণেই এই তিনটি নীতির মধ্যে কোনও একটিকে অন্য দু'টির থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু তবুও আমি বলব, কেউ যদি এই তিনটি নীতির মধ্যে দুই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতিকে একটু বিশেষভাবে এবং আলাদা করে গুরুত্ব দেন এই কারণে যে, সমস্ত প্রকার গতি এবং পরিবর্তনের পিছনকার মূল কারণ হল বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব, তাতে আমি অতটা আপত্তির কারণ দেখি না। যদিও আমি মনে করি, বাকি দুটো নীতিও একই সাথে ক্রিয়া করে।

কিন্তু কেউ কেউ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নীতি হিসাবে দুই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতিকে একান্ত করে বোঝবার ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। দুই বিরোধী শক্তির ঐক্য সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণার ফলে একদল তাত্ত্বিক মনে করেন, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যেও সবসময়ই বুর্জোয়া ও প্রোলেটারিয়ান এই দুই লাইনের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, অর্থাৎ একই পার্টির মধ্যে যেন দুটো ভিন্ন কেন্দ্র থেকে এই দুই লাইনের সংগ্রাম পরিচালিত হয়। এধরনের ধারণা মার্কসবাদের ভ্রান্ত উপলব্ধি থেকে গড়ে উঠেছে। একথা ঠিক, একটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা সকলেই একই চিন্তাধারা এবং একই চিন্তাপদ্ধতি নিয়ে চলার চেষ্টা করেন এবং এইভাবেই পার্টির নানা কর্মকাণ্ড তাঁরা পরিচালনা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতার পার্থক্যের জন্য, উপলব্ধির মানের পার্থক্যের জন্য, তাঁদের মধ্যে নানা প্রশ্নে দ্বন্দ্ব দেখা দিতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। একথা ঠিক যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অভ্যন্তরে এই দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে কোনও কোনও প্রশ্নে ঠিক-বেঠিকের দ্বন্দ্ব থাকে এবং সেই অর্থে বিরোধের মধ্যে ঐক্য কাজ করে। আবার একথাও সত্য, কোনও কোনও সময় পুঁজিবাদী সমাজ পরিবেশ থেকে পার্টিতে বুর্জোয়া শ্রেণীচিন্তার প্রভাবও পড়তে পারে। কিন্তু, একথা সত্য নয় যে, সেই কারণে পার্টিতে দুই শ্রেণী লাইনের দ্বন্দ্ব ঢালাওভাবে সবসময়েই ক্রিয়া করে। এ ধারণা সঠিক মার্কসবাদী ধারণা নয়। কিন্তু যেহেতু এই মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একই অরবিট-এ (বলয়ে) অবস্থান করে তাই মত বিনিময়ের মারফত, আদর্শগত সংগ্রামের মারফত, ঐক্যে পৌঁছানোই এবং ঐক্যকে সুদৃঢ় করাই হচ্ছে এই দ্বন্দ্বকে সমাধান করার সঠিক পদ্ধতি। এভাবে না বুঝলে এই দ্বন্দ্বের চরিত্রকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

নিগেশন অব নিগেশন

এরপর আসছে নিগেশন অব নিগেশন-এর নীতি। কোনও ফেনোমেনন, কোনও সত্তা বা কোনও একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থার যখন বিকাশ ঘটে তখন বিষয়টা নিশ্চয়ই এমন হতে পারে না যে, যে জিনিসটার যখন বিকাশ ঘটল সেটা শুরুতে যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছিল, বিকাশের পরেও সেসব বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিরাজ করছে বা ভবিষ্যতেও সেসব বৈশিষ্ট্য নিয়েই সে অবস্থান করবে। না, সেরকম হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এখন নিগেশন অব নিগেশন কথাটার তাৎপর্য কী? না, পুরনো যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় তার বিকাশ হল সেটা তো শুধু ধ্বংস নয়। আমরা আলোচনা করছি, বিকাশের নিয়ম। শুধু ধ্বংস যদি বলি, তাহলে বিষয়টা পুরোপুরি ধ্বংস করা হল, যার মানে সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এখানে তো শুধু ধ্বংস নয়, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুনের সৃষ্টি।

ধরুন, প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি মানুষের ভিতর পরিবর্তন ঘটছে। ঘটছে বলেই তো কেউ হঠাৎ একদিনে শিশু থেকে কিশোর হয় না। আবার কিশোর থেকে দুম করে কেউ আবিষ্কার করে না যে সে যুবক হয়েছে, বা হঠাৎ করে কারোর মনে হয় না যে তার যৌবন আর নেই, সে প্রৌঢ় হয়েছে। এগুলো হঠাৎ করে, বা লাফিয়ে লাফিয়ে হয় না। আসলে বুঝতে হবে, প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি মানুষের মধ্যে শরীরগত ও মনোগত সমস্ত দিক থেকে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যদিও একথা ঠিক, প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের জন্য মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে যায় না। এভাবে না বুঝলে ক্ষতি হয়ে যাবে।

এখানে নিগেশন অব নিগেশন-এর নীতিকে বুঝব কী করে? নিগেশন অব নিগেশন-এর নীতিকে এখানে বুঝতে হবে এভাবে যে, শৈশব নিঃশেষিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই কৈশোরে যাওয়ার পরিবর্তনগুলো পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে। একেই সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা বলি, বিকাশের পথে অবলুপ্তি, অবলুপ্তির পথে বিকাশ। এই বিকাশ এবং অবলুপ্তি ঘটে চলেছে নিগেশন অব নিগেশন-এর পথ বেয়ে। শুধু যদি অবলুপ্তি

বলি, তাহলে তো আর বিকাশ হয় না। যেটা অবলুপ্ত হল সেটাকে শুধু ধ্বংস বলে ছেড়ে দিলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ বোঝা হয় না। কারণ, তাকেও আবার ধ্বংস না করলে তো আমরা বিকাশের পথে এগোতে পারি না। আবার, কোনও ফেনোমেননের যখন প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের ধারায় বিকাশের পথে অবলুপ্তি ঘটে সেটাতেও প্রক্রিয়াটা থেমে থাকতে পারে না। এভাবে যখন বিশেষ পর্যায়ের অবলুপ্তি ঘটে তাকে নিঃশেষিত করার পথেই, অর্থাৎ তাকে আরও ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই সে আবার অবলুপ্তি থেকে বিকাশের পথে এগুতে থাকে। এই হল নিগেশন অব নিগেশন।

ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদ সম্পর্কে আমার যে উপলব্ধি সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে আমি বিষয়টাকে একটু সহজভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলাম যাতে সকলেই সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। আবার বলি, নিগেশন অব নিগেশন কথাটার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ক্রমাগত নিঃশেষ করার মধ্য দিয়ে আগেরটার সাথে ছেদ ঘটিয়ে আবার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বস্তুর বা বিষয়ের বিকাশ এবং তার পরিণতি লাভ। এই ক্রমাগত নিঃশেষ করার মধ্যে রয়েছে প্রতিটি স্তরে নিগেশন অব নিগেশন নীতির প্রক্রিয়া। তার ফলেই সেটা বিকাশলাভ করছে। সুতরাং পুরনোকে ধ্বংস করব না অথচ নতুনকে সৃষ্টি করতে চাই, এটা হতে পারে না। আর নতুন সৃষ্টি তখনই হতে পারে, যখন আগেরটা ধ্বংস করার দ্বারা যেটা পেলাম সেটাকেও আবার ধ্বংস করা হল। এজন্যই বলা হচ্ছে, ডাবল নিগেশন (দু'বার ধ্বংস)। অর্থাৎ একটি বস্তু নিজেকে নিঃশেষ করতে করতেই নতুন নতুন উপাদানের বিকাশ ঘটাতে থাকে, আবার এই ক্রমবিকশিত উপাদানগুলিও আপন বিকাশের পথে বস্তুকে ধ্বংস করতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে শক্তিশালী করার সংগ্রামকে কীভাবে বোঝা উচিত সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলছি। আসলে আজ আমরা যে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে যুক্ত আছি সেই শ্রেণীসংগ্রামকে ক্রমাগত বিকশিত করার সংগ্রাম এক অর্থে শ্রেণী অবলুপ্তি ঘটাবার সংগ্রাম। অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামকে ক্রমাগত শক্তিশালী ও তীব্রতর করার পথেই, এর অগ্রগতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতে একদিন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে শ্রেণীসংগ্রামের অবলুপ্তি ঘটানো। সুতরাং মানবসভ্যতার বিকাশের বর্তমান স্তরে পার্টিকে হাতিয়ার না করে, পার্টির সঠিক রাজনীতিকে হাতিয়ার না করে, আমরা যেমন এক পা-ও এগোতে পারি না, আবার ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন পার্টির শাসনের প্রয়োজন নিঃশেষ হবে, সেদিন পার্টি এবং সমাজ আইডেন্টিফায়েড (একাত্ম) হয়ে যাবে। তাই প্রকৃত কমিউনিস্টরা বিপ্লবের স্বার্থে পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে একথা যেমন সত্য, সাথে সাথে একথাও সত্য, তারা কখনই পার্টি ফ্যানাটিসিজম (পার্টি অন্ধতায়) ভোগে না। কারণ তারা জানে, যেদিন পার্টি সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে সেদিন পার্টির আলাদা করে কোনও প্রয়োজন থাকবে না। সেই আগামীদিনে যদি কেউ পার্টির এলিমিনেশন (অবলুপ্তি), অর্থাৎ নিগেশন অব নিগেশন-এর পথে বাধা সৃষ্টি করেন, তাহলে তিনি সেদিন সেই অবস্থায় সমাজের অগ্রগতিতেই বাধা সৃষ্টি করবেন। নিগেশন অব নিগেশন-এর নীতির সঠিক উপলব্ধি এই কারণে এতটা জরুরি।

এই যে মূল তিনটি নীতি নিয়ে আলোচনা হল, এই তিনটি মূল নীতির ভিত্তিতেই সমস্ত বস্তু পরিচালিত হয়, আর এই তিনটি নীতিই একইসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু মার্কসবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ প্রসঙ্গে বলা দরকার। সেটা হচ্ছে, যখন কোনও একটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটা জিনিসের সংমিশ্রণ ঘটে যাকে পাঁচমিশেলি বস্তু বলা হয় তখন তার মূল চরিত্র কী দিয়ে নির্ধারণ করব? সবসময়েই মনে রাখতে হবে, এই পাঁচমিশেলি বস্তুর মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটা তা দিয়েই পাঁচমিশেলি বস্তুর চরিত্র নির্ণয় করতে হবে। এটা রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, মানুষের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এমনকী একটা মানুষ ভাল কি মন্দ সেটা বিচার করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষ মাত্রেই ভালমন্দ মিশিয়েই মানুষ। এরকম মানুষ আমরা চিন্তা করতে পারি না যে মানুষের মধ্যে কোনও ত্রুটি নেই। এরকম মানুষ থাকতেই পারে না। আবার একইভাবে কোনও মানুষের মধ্যে সবটাই মন্দ, কোনও কিছু ভাল নেই, এরকম ঘটনা ঘটে না। সুতরাং যেখানেই পাঁচমিশেলি বস্তুর অবস্থান দেখা যায় সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রধান বৈশিষ্ট্য কী সেটা নির্ণয় করার দ্বারাই সেই বস্তুর মূল চরিত্র নির্ধারণ করতে হয়। নাহলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করা যায় না। অন্য দিক থেকেও বিষয়টা দেখা যেতে পারে। ধরুন, একই মানুষ এক সময়ে আমাদের পক্ষে কথা বলল, আবার আর এক সময়ে বিরুদ্ধে

কথা বলল। যখন পক্ষে কথা বলল, কমরেডরা মনে করে, লোকটি আমাদের পক্ষের লোক। আবার বিরুদ্ধে বললে মনে করে, সে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এ সব চিন্তা হচ্ছে অতিসরলীকরণের ফল। এমন হতে পারে, সে মানুষটার চিন্তাগত মৌলিক কাঠামোটা হচ্ছে আমাদের বিরোধী, কিন্তু দু'চারটি ভাল ভাল কথা বলে। এরকম মানুষকে কখনও কখনও কাজে লাগানো যেতে পারে এই পর্যন্ত, কিন্তু তার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। তার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে অনেকটা শ্রেণীশত্রুর মতো। যখন কিছু কাজেও আসে তখনও খুব সজাগ থেকেই সেটা করতে হবে। আবার হতে পারে সে শ্রেণীশত্রু নয়, কিন্তু তার মধ্যে নানা উল্টোপাল্টা চিন্তার প্রভাব আছে বলে অনেক সময় মনে হয় সে পার্টিবিরোধী। সেক্ষেত্রে তার সম্পর্কে আমাদের মনোভাব হবে বন্ধুর মতো, শত্রুর মতো নয়, শুধু তার বিভ্রান্তিটা কাটাতে হবে, নাহলে সে জনতার পক্ষের লোক।

বস্তু বা তার পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক নিয়ম সংক্রান্ত ধারণা কোনটাই শাশ্বত নয়

এখানে প্রশ্ন এসেছে যে, আমরা যে বলছি সব কিছুই বস্তুভিত্তিক, বস্তুবহির্ভূত কোনও সত্তা নেই, তাহলে কি আমরা একথা বলতে পারি না বস্তুই হচ্ছে শাশ্বত সত্য? একইভাবে যে তিনটি নীতি বস্তুর সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজ করে সেগুলোকেও আমরা শাশ্বত সত্য বললে ক্ষতি কী? আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যখন বিশেষ বস্তুকে বস্তু বলি সেটা যেমন বস্তু, অর্থাৎ ধরুন তার ভর আছে, কিছু না কিছু স্পেস-এ তা অবস্থান করে, এ সবকিছুই আছে, কিন্তু সেই বস্তু বলতে আমরা দুনিয়ার সমস্ত বস্তুকে বোঝাই না। কারণ কোনও একটি বিশেষ বস্তু সব বস্তুর স্রষ্টা নয়। তাহলে সমস্ত বিশ্ব এবং বস্তুজগৎকে আমরা কীভাবে দেখব? আমরা সমস্ত বিশ্ব ও বস্তুজগৎকে দেখব বস্তু ধারণায়। আমাদের বুঝতে হবে, বস্তু থেকেই বস্তুর সৃষ্টি, বস্তু-বহির্ভূত কোনও বিশেষ সত্তার অস্তিত্ব নেই। সে অর্থে ঐ বিশেষ বস্তুটা একই সাথে বস্তু, আবার বস্তু নয়। বস্তু ধারণা সম্পর্কে লেনিন খুব সুন্দর কথা বলেছেন। বলেছেন, ম্যাটার ইজ এ ফিলজফিক্যাল ক্যাটিগরি (বস্তু হচ্ছে একটা দার্শনিক ক্যাটিগরি)। একথার মধ্য দিয়ে লেনিন যা বোঝাতে চেয়েছেন, তাহল, মানুষ যা অতীতে ভেবেছে, বর্তমানে ভাবছে, বা ভবিষ্যতে ভাবতে পারে, এর সমস্ত কিছুই বস্তুভিত্তিক, বস্তুবহির্ভূত কিছু নয়। বস্তুকে একটা দার্শনিক ক্যাটিগরি বলতে তিনি কোনও বিশেষ বস্তুকে বোঝাননি।

কিন্তু এই বস্তু কি শাশ্বত, নির্বিশেষ, অ্যাবসোলিউট? না, সেটা ঠিক ধারণা নয়। কেন একথা বলছি? কোন অর্থে বস্তু শাশ্বত নয়? কারণ যে বস্তুকে আমরা জানছি সেটা নিয়ত পরিবর্তনশীল, প্রতিমুহূর্তে বিরোধী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বস্তুর সেই পরিবর্তনটাও আমরা জানতে পারছি, বুঝতে পারছি। সেই অর্থেই বস্তু শাশ্বত বা অ্যাবসোলিউট নয়। তাহলে বস্তু ধারণা এমন নয় যে, বস্তু অপরিবর্তনীয়। এ ধারণা সত্য নয়। সুতরাং যা কিছু পরিবর্তন ঘটছে সেটা ভেরিফায়েবল অ্যান্ড সাবজেক্ট টু ভেরিফিকেশন (বিচারযোগ্য এবং বিচারের উপর নির্ভরশীল)। সুতরাং যে বস্তু সর্বত্র বিরাজমান, বস্তুবহির্ভূত কোনও সত্তা বলে যেখানে কিছু নেই, সেই বস্তুর শাশ্বত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কেননা সে বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু বস্তুময় এই জগৎকে দেখে অনেকে বলতে পারেন, সবকিছুতেই যখন আমরা বস্তুর অস্তিত্ব দেখতে পাই, তাহলে বস্তুকে শাশ্বত বলায় দোষ কোথায়? আসলে শাশ্বত না বলে এক্ষেত্রে আমাদের বলা উচিত, বস্তু হচ্ছে ইউনিভার্সাল। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার সবকিছুই বস্তু, বস্তুবহির্ভূত কিছু নেই। আমাদের যা কিছু চিন্তাচেতনা বা ক্রিয়া সব বস্তুভিত্তিক। আবার বস্তু স্থির, নিশ্চল, বা অপরিবর্তনীয় নয়। বস্তু গতিময় বস্তু, নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তু। সুতরাং বস্তু কোনওমতেই অপরিবর্তনীয়, অ্যাবসোলিউট বা শাশ্বত নয়। আর বিশ্বপ্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন হয়ে চলেছে, কগনিশন-এর (বোধের) পরিবর্তন হচ্ছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবর্তনের নিয়ামক যে তিনটি মূল নীতি তার উপলব্ধিরও পরিবর্তন হচ্ছে — সেটা আরও পরিষ্কার, প্রাঞ্জল, গভীর এবং পেনিট্রেটিং (তীক্ষ্ণ) হচ্ছে। সেই অর্থে তিনটি মূল নীতি কোনও শ্বাশ্বত রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। আর আমাদের দর্শন বস্তুবাদী দর্শন এই কারণে যে, বস্তুনিরপেক্ষ বা বস্তুবহির্ভূত কোনও সত্তার অস্তিত্ব নেই এই দুনিয়াতে। আর আমাদের দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এইজন্য যে, যে বস্তুকে আমরা জানছি সে বস্তু

নিজেই দ্বান্দ্বিক, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সে পরিবর্তিত হচ্ছে। বস্তুর চরিত্র দ্বান্দ্বিক বলেই আমাদের দর্শনও হল দ্বান্দ্বিক বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

আদিতে মানুষের চিন্তা ছিল বস্তুবাদী

এবার আমি সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত আদিম মানুষের চিন্তা যে বস্তুবাদী চিন্তা ছিল, তারপর কীভাবে এবং কোন কারণে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হল, কোন পরিস্থিতিতে মানুষের মনে ভাববাদী চিন্তার উন্মেষ হল, এসব কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা করে যেতে চাই। মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে এক সামগ্রিক ধারণা আয়ত্ত করবার জন্য এসব বিষয় সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই বিষয়গুলি আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে যেতে পারে। সেগুলি যেমন যেমন প্রয়োজন তেমন তেমন ভাবেই আমি আলোচনা করব। হাতে সময় যেহেতু কম, সুতরাং বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ আমার নেই।

একথা মনে রাখতে হবে, যেহেতু মানুষের মস্তিষ্কের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের জন্যই চিন্তা করার ক্ষমতা বা পোটেনশিয়ালিটি তার মধ্যে ছিল, তাই বাইরের জগতের সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তার মধ্যে চিন্তার স্ফূরণ ঘটতে শুরু করে। প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। কেউ তাকে সেদিন তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়নি। একদিকে হিংস্র জীবজন্তু এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিজের মতো করে মোকাবিলা করেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। সেদিনকার সেই বাঁচার সংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সকলের সঙ্গে এক হয়েই তাকে লড়তে হয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেই তাকে বাঁচতে হয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে একথা বলতেই হবে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রথম চেতনা হল এটাই যে, সে একা বাঁচতে পারবে না। তাই একথা বলা যায়, ঐক্যবদ্ধভাবেই যে তাকে লড়তে ও বাঁচতে হবে, এটাই হল মানুষের প্রথম চেতনা। এভাবেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সামাজিক জীব হয়েছে। অন্য অনেক জীবজন্তু একত্রে বাস করেছে, কিন্তু তারা সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। কেননা তাদের সেই চেতনা ছিল না, থাকার কথাও নয়।

আদিম সমাজবদ্ধ মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যখন লড়াই করেছে তখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নানা চিন্তা তার মগজে ধাক্কা দিয়েছে। চিন্তা করার ক্ষমতাটুকু বাদ দিলে সেই আদিম যুগে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সেই মানুষ ধীরে ধীরে সমাজবদ্ধ হল এবং পারিপার্শ্বিকের সাথে লড়াই করেই যাত্রা শুরু করল। এরকম একটা পর্যায়ে মানুষের মগজে ধাক্কা দিতে থাকল — সূর্য কেন ওঠে, অমাবস্যা-পূর্ণিমা-জোয়ার-ভাটা কেন ঘটে, দিন-রাতের পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন কেন হয়? আকাশ কী, তারা কী, হাওয়া কী — এ ধরনের নানা জিজ্ঞাসা মানুষের মনে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে সেদিনকার অবস্থায় তাদের মতন করে। সেদিন কিন্তু মানুষ ভাবেনি, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন ভগবান। এমন কোনও চিন্তা মানুষের মগজে সেদিন ধাক্কা দেয়নি। তাই ভাববাদ বা ঈশ্বরতত্ত্বের সেদিন জন্ম হয়নি। 'থিংকিং ইজ দ্য কনটেমপ্লেশন অব গড' (চিন্তা হচ্ছে ঈশ্বরের কল্পনার ফল) — একথা যদি সত্য হত, তাহলে আদিম মানুষের চিন্তায় এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যেত। কারও না কারও চিন্তায় সে সব প্রকাশ পেত। ইতিহাস ঘেঁটে বা নানা গবেষণার সাহায্যে একটি বিষয় দেখা গেছে যে, সমাজ যে সময়ে এসে শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে, তার আগে কোনও ভাববাদী ধারণা বা ঈশ্বরতত্ত্বের চিন্তা সমাজে দেখা দেয়নি। বস্তুনিরপেক্ষ কোনও সত্তার ধারণার কোনও হদিস আদিম সমাজে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন গবেষক, বিশেষ করে মর্গ্যান, এমন কোনও প্রমাণ পাননি। সে সময় মানুষ যা কিছু সাধনা করেছে, যা কিছু নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে, বশীভূত বা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে, সবকিছুই ছিল বস্তু বা বস্তু দ্বারা গঠিত। তারা যেসব জিনিস সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে সেগুলো হল — মাটি, জল, বায়ু, আগুন, পাথর, এসব। এর কোনটাই নির্বস্তু সত্তা নয়। মানুষ সেদিন বস্তুবহির্ভূত কোনও সত্তার বা শক্তির কথা ভাবেনি। যা কিছু শক্তির কথা সে ভেবেছে সেটা বস্তুরই ভৌত শক্তি। আমি এই আলোচনা করছি একটা জিনিসই দেখাবার জন্য, তা হচ্ছে, সেদিন মানুষের চিন্তা ছিল বস্তুবাদী। বস্তুর বাইরে সে কিছু চিন্তা করতে পারেনি। সে চিন্তা করেছে বস্তুবাদভিত্তিক, ভাববাদভিত্তিক নয়, যদিও সেদিনকার সে বস্তুবাদ নামেমাত্রই বস্তুবাদ, তার বেশি কিছু নয়।

বস্তুকে জানবার চেষ্টা মানুষের সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটা ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা নিয়েই মানুষ সব কিছু জানবার চেষ্টা করেছে। বস্তুকে জানবার জন্য আদিম মানুষ সেদিন যে প্রচেষ্টা করেছে সেটাকে বলা হয় আদিম মানুষের বিজ্ঞান, যার সাথে আজকের বিজ্ঞানের যথার্থ কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেহেতু মানুষ মনে করেছে, এইসব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই প্রকৃতির শক্তিকে সে বশীভূত করতে পারবে, জানতে পারবে, সেই কারণেই তাকে বিজ্ঞান বলা হয়েছে। আদিম মানুষের এই বিজ্ঞানকেই বলা হয় মন্ত্রতন্ত্র বা ম্যাজিক। যদিও ম্যাজিক বলতে আমরা আজ যা বুঝি, এটা সে ম্যাজিক নয়। আসলে এই মন্ত্রতন্ত্র বা ম্যাজিকের সাহায্যে মানুষ সেদিন কিছুই জানতে পারেনি, জানার কথাও নয়। মানুষ যা কিছু জেনেছে সেটা সে ঘা খেয়েই জেনেছে, জেনেছে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। মানুষ সেদিন যেসব বস্তুকে বশীভূত করতে চেয়েছে সেগুলোকে সামনে রেখে নানাভাবে নানা অঙ্গভঙ্গি করেছে। হয়তো পাথর চাপা পড়ে কেউ মারা গেল তখন পাথরকে সামনে রেখেই নানা অঙ্গভঙ্গি করেছে। আগুনে অনেক কিছু পুড়ে গেল, একটু আগুন জ্বালিয়ে তার চারিদিকে নেচেছে, নানা অঙ্গভঙ্গি করেছে। হাত-পা নাড়া, অঙ্গভঙ্গি করা, তার সাথে বিড় বিড় করা, সেগুলোই পরবর্তী সময়ে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকে অনেক পরিমার্জিত হয়ে আজকের মন্ত্রের রূপ নিয়েছে। আদিম মানুষের আগডুম বাগডুম কুঁইকাঁইগুলোই বদলাতে বদলাতে পরবর্তীকালে শ্লোক বা মন্ত্রতন্ত্র হয়েছে। আজ আমরা যে পূজোআচ্ছা দেখি সেই মন্ত্রতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল ভগবৎ বিশ্বাস। পুরনো মন্ত্রতন্ত্র অনেক পরিমার্জিত হয়ে, অনেক সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ভগবৎ বিশ্বাসকে আশ্রয় করে আজকের মন্ত্র এসেছে যার সাথে সেদিনকার মন্ত্রতন্ত্রের বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

আমি শুরুতেই বলেছি, বস্তুবাদী চিন্তার একটা ইতিহাস আছে। আবার ভাববাদ আসবার পর ভাববাদী চিন্তার বিকাশ ও অগ্রগতিরও একটা ইতিহাস আছে। কিন্তু বস্তুবাদী দর্শন ভাববাদী দর্শনের চেয়ে বনেদি। আমি আগেই বলেছি, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষের চিন্তায় ভাববাদের জন্ম হয়নি। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে দ্বন্দ্ব আমরা দেখছি, পৃথিবীতে সেদিন সেই দ্বন্দ্বের জন্মই হয়নি। তাহলে সেদিন সমাজের অগ্রগতি ঘটেছে কী করে? কারণ দ্বন্দ্ব ছাড়া তো কোনও গতি ঘটতে পারে না। যে মূল দ্বন্দ্ব সেদিন সমাজের অগ্রগতির পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে সেটা হল, প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ প্রকৃতিকে জানবার জন্য মানুষের যে লড়াই সেটাই ছিল সেদিনের মূল দ্বন্দ্ব। প্রকৃতিকে জানবার জন্য, জয় করবার জন্য মানুষ সংগ্রাম করেছে। তাকে আয়ত্ত করে জীবনের মান উন্নত করার জন্য কাজে লাগিয়েছে। অত্যন্ত রুডিমেন্টারি ফর্মে (আদিম রূপে) হলেও উৎপাদন এসেছে, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এসেছে। আজকের চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রামের যুগে সেই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়েছে, উন্নত হয়েছে। ভবিষ্যতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা পত্তনের পরও উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির এই দ্বন্দ্ব থাকবে, কিন্তু এই দ্বন্দ্বের যে বিরোধাত্মক রূপ তার অবসান ঘটবে। প্রকৃতিকে জানবার জন্য, অজানাকে জানার জন্য, তাকে আয়ত্ত করার জন্য, সভ্যতাকে ক্রমাগত বিকশিত করার জন্য সংগ্রাম চলতেই থাকবে। সুতরাং সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছে সমাজের অগ্রগতি বন্ধ হবে না, স্তরে স্তরে উন্নত থেকে উন্নততর সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ক্রমাগত এগিয়ে যাবে।

আজকের সমাজ যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বই যে এই সমাজের মূল দ্বন্দ্ব, সেকথা আপনারা জানেন। কিন্তু আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে শোষক-শোষিতের বিভাজন বা দ্বন্দ্ব ছিল না। সেদিন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়নি। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, মালিক মজুরকে যে শোষণ করে, জমিদার চাষীকে যে শোষণ করে, আর দাসপ্রভুরা দাসদের উপর যে কী অত্যাচার করেছে, সে সব নিদারুণ কাহিনী ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু সেই আদিম সমাজে অর্থাৎ আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীসংঘর্ষের সৃষ্টি হয়নি। তখন শ্রেণীরই জন্ম হয়নি। যদিও একথা ঠিক, মানুষ নানা জিনিস নিয়ে লড়ালড়ি করেছে, এক টুকরো মাংস কে আগে খাবে সে সব নিয়ে লড়াই করেছে, তা সত্ত্বেও কিন্তু সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়নি। তাহলে প্রশ্ন হল, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হল কী করে?

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমাদের খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার, যেটা না বুঝলে শ্রেণীবিভক্তির কারণকে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব না। সেটা হল, মানুষের প্রয়োজনকে কোথাও বেঁধে রাখা যায় না। মানুষের প্রয়োজন ক্রমাগত বাড়বে, বাড়াটাই স্বাভাবিক। আদিম মানুষ ঝড়-বাদলের সময় একটু গাছের

আড়াল পেলে বা গুহায় জায়গা করে নিতে পারলে মনে করত যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছে, যেন রাজপ্রাসাদে বাস করছে। আজকের মানুষের স্বর্গসুখ বা রাজপ্রাসাদে বাস সম্পর্কে ধারণাটা সেরকম নয়। আজ যেটা আপনাদের ন্যূনতম প্রয়োজন, আদিম মানুষের কাছে সেটা ছিল অকল্পনীয়। যেসব উপকরণ না পেলে আপনি ভাবেন বোধ হয় পাগল হয়ে যাবেন, আদিম মানুষের কাছে সেসব ছিল আকাশকুসুম কল্পনা। সুতরাং যত দিন গেছে মানুষের প্রয়োজন তত বেড়েছে, প্রয়োজনের ধারণাও পাল্টে গেছে। সেই আদিম যুগে মানুষের মূল সমস্যা যেটা দেখা দিল, সেটা হল, প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা। তাই বণ্টন নিয়ে মানুষে মানুষে ঝগড়া দেখা দিল। একটা পর্যায়ে সমস্ত মানুষের চেষ্টায় যে অনাবাদী জমিগুলোকে চাষযোগ্য করা হল, যাদের গায়ের জোর বেশি ছিল তারাই লাঠি আর গায়ের জোরে সে জমির মালিক হয়ে পড়ল। গোষ্ঠীপতিরা, যোদ্ধারা, তাকতওয়ালা লোকেরা গায়ের জোরে গোষ্ঠীর অপরাপর সমান হিস্যাদার লোকগুলোকে দাসে পরিণত করল, করে নিজেরা মালিক হল। আর ঐ বিনিপয়সার গোলামগুলোকে গোলাম হিসেবে খাটিয়ে নিজেরা আরাম এবং আমিরি করতে শুরু করল।

আবার এরও আগে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের আদিম অবস্থায় গোষ্ঠীগুলো যে যাযাবর জীবন যাপন করত, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফলমূল আহরণের জন্য ঘুরে বেড়াত, তখন এক জায়গায় দুটো গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ হলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হত। একদল হারত, আর একদল জিতত। যারা হারত, স্বাভাবিকভাবেই তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হত। আর যারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করত তারা বাকিদের ওপর খবরদারি করত। সুতরাং এসব প্রক্রিয়ায় কালক্রমে দাসমালিক বা বড়লোকের সৃষ্টি হল। তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও জন্ম হল। অর্থাৎ একদিকে বেশিরভাগ দাস, অপরদিকে মুষ্টিমেয় কিছু দাসপ্রভু — গোটা সমাজ এভাবে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, দুটো শ্রেণীর জন্ম হল।

যখন পশুপালন শুরু হল, বিশেষ করে যখন চাষবাস শুরু হল, যখন উৎপাদিত দ্রব্যকে জমিয়ে রাখার সুযোগ দেখা দিল, তখনই যারা লড়াকু, যাদের গায়ের জোর বেশি বা যারা গোষ্ঠীপতি তারা গায়ের জোরে অপরকে হঠাতে শুরু করল। মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং জোগানের স্বল্পতা এই দুইয়ের দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করেই চাষবাস আসার পর, স্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টি হওয়ার পর সমাজ কালক্রমে শ্রেণীবিভক্ত হল। যাদের গায়ের জোর বেশি ছিল তারা অপরকে ঠকিয়ে সব নিয়ে নিল। এমনকী যে জমি কেউ অপরের কাছ থেকে কেড়ে নিল, কেড়ে নেওয়ার পর সেই জমির উপর তার মালিকানাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলল। এরই পথ বেয়ে সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে আইন এল, নিয়মশৃঙ্খলা এল, দাস এবং দাসপ্রভু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম অবস্থায় জমির উপর দাসপ্রভুদের অধিকার সাধারণ মানুষ মেনে নিতে চায়নি। কেননা যাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হল তারা তো সকলেই জানে যে, সকলে মিলেই একত্রে সেই জমি উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু বহু যুগ অতীত হওয়ার পর মানুষ এসব কথা ভুলে গেল। ধীরে ধীরে তারা সকলেই এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। মনে করল, জমিটা মালিকেরই সম্পত্তি, ওই জমির উপর তাদের কোনও অধিকার নেই। সে নিজেকে ভাবতে শুরু করল, সে ভিক্ষুক, ভিক্ষুকের ঘরেই সে জন্মেছে। সে ভুলেই গেল, ঐ জমির মালিকের পূর্বপুরুষ ও ভিক্ষুকের পূর্বপুরুষের অবস্থা অতীত দিনে একইরকম ছিল। এসব কথা সকলকে ভুলিয়ে দেওয়া হল। এরকম এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অন্যায় ও জবরদস্তির পথ বেয়ে জমির উপর ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল। এ অবস্থা থেকে শুরু হল শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের অবসান ততদিন ঘটবে না যতদিন না মানুষের প্রয়োজন মেটাবার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে এবং উৎপাদনের উপর সমান বণ্টনের নীতি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

আমরা যদি বর্বর যুগ থেকে শুরু করি তাহলে বলতে পারি, তার পরবর্তীকালে এসেছে দাস-দাসপ্রভু সমাজ, তারপর সামন্ততন্ত্র, তারও বহু পরে এল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা — বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জীবন ও যুগ। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানেই হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে কয়েকটি দেশে এসেছে সমাজতন্ত্র বা সর্বহারা একনায়কত্ব। তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্তর পার করে দিয়ে আসবে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা, যেখানে গিয়ে এই সোস্যাল অ্যান্টাগনিজম (সামাজিক বিরোধ), অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব আজ আমরা দেখছি সেই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের অবসান হবে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এল ভাববাদী চিন্তা

এখন প্রশ্ন হল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভাববাদী চিন্তার জন্ম হল কী করে? এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাব, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর একটা সময়ে এসে মানুষ দেখল, সমাজে সব কিছুই নিয়ম অনুযায়ী চলছে। কেউ মনে করছে প্রভুকে সেবা করাই তার কাজ, সে তাই করছে। যার ধান ভানার কাজ সে সেকাজই করে যাচ্ছে। কর্মচারীরা, পাইক বরকন্দাজরা যার যা কাজ তারা নিজেরা প্রত্যেকেই সেই অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। আর রাজা শাসন চালাচ্ছে। সকলে এসব মেনে নেওয়ার ফলে সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। গোটা ব্যাপারটা ঠিক এতটাই গুছিয়ে মানুষ ভেবেছিল তা নয়। কিন্তু যা বললাম তার সাথে অনেক মিল ছিল। এরকম একটা সময়ে মানুষের মাথায় একটা চিন্তা ধাক্কা দিল, সেটা হল, সমাজে একজন রাজা আছে বলেই, বা প্রভু আছে বলেই, সব কিছু নিয়ম মেনে চলছে। তিনি সমাজটাকে যেমনভাবে চালাতে চাইছেন তেমনভাবে সমাজ চলছে। সুতরাং এই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও নিশ্চয়ই একজন কেউ অধিপতি আছেন যিনি সবকিছু চালাচ্ছেন। এরকম কেউ না থাকলে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র বা গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ম মেনে চলছে কী করে? নিয়ম মেনেই সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে। এসব ঘটনা ঘটছে কী করে? এইসব কিছু পরিচালনার জন্য একজন কর্তা না থাকলে গোটা দুনিয়াটা এমন নিয়ম মেনে চলতে পারে না। এই অ্যানালজি থেকে, এ ধরনের এক সাদৃশ্যের ধারণা থেকে মানুষের মাথায় এরকম একটা চিন্তা ধাক্কা দিল। সেখান থেকেই শুরু হল বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা ভগবানের ধারণা। অর্থাৎ সমাজের ভিতরে নিয়ম-কানুন-অনুশাসন প্রভৃতি চালু করেছিল যেসব কর্তারা তারাই এই অর্থে কল্পনায় রূপ পেয়ে গেল বিশ্বের বাইরে। আর এরই ফল হল ঈশ্বরতত্ত্ব। সমাজে ঈশ্বরচিন্তা আসবার এটাই হল ইতিহাস। এরপর শুরু হল সেই ঈশ্বরের নানা অপূর্ব ব্যাখ্যা। যে যেমন ভেবেছে সে সেরকমভাবে ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করেছে। কেননা এর তো প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নেই। তাদের সেই ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য হল কিনা, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা, কোনও কিছুই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক, বস্তুবাদী চিন্তার যে ধারা যেটা আদিম সমাজ থেকে শুরু হয়েছিল সেটা তো ছিলই, আবার শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এসে ঈশ্বরচিন্তা এবং ভাববাদী চিন্তাও জন্ম নিল। তারপর থেকে দর্শনচিন্তার এই যে মূল দুটো ধারা, এই দুটোই পাশাপাশি অবস্থান করেছে। এই দুটো দর্শনই বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে, বিকশিত হয়েছে এবং এ দুই দর্শনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতও অবিরাম চলেছে। বিশেষ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আসবার পর সে শুধু ভাববাদী দর্শনকেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করেছে তাই নয়, পুরনো সমস্ত বস্তুবাদী দর্শনের মূল ত্রুটি কোথায় সেটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে।

একথা ঠিক, ভাববাদী দর্শন আসবার পর থেকে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়ে শোষকশ্রেণীর হাতে শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজেই তা প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা বলেন, ভাববাদী দর্শন চিরকালই শোষকশ্রেণীর হাতের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আর বস্তুবাদী দর্শন সমস্ত যুগেই শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার হয়েছে, তাঁদের এহেন চিন্তা অনৈতিহাসিক, অবাস্তব, অতিসরলীকৃত। ভাববাদী দর্শনের জন্ম হয়েছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, শ্রেণীশাসনের স্বার্থেই সেটা প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেই ভাববাদী দর্শনও জনগণকে নিয়ে কারবার করতে গিয়ে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নানা সময়ে শোষিত জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার সেই যুগের বস্তুবাদী দর্শন যা মূলত বস্তুতান্ত্রিক এবং যার জন্ম সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হবার আগেই এবং যা আদিম সময়ের চিন্তাধারারই ধারাবাহিকতা মাত্র, সেই বস্তুবাদী দর্শনেরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তবু দেখতে পাওয়া গেছে, বিশেষ বিশেষ সময়ে বস্তুবাদী দর্শনের বিশেষ বিশেষ রূপ যাই থাকুক না কেন সেই বস্তুবাদী দর্শনও বিভিন্ন সময়ে শোষকশ্রেণীর হাতে চূড়ান্তভাবে অপব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ধরুন, খ্রিস্টধর্ম আসবার আগে একদল স্বৈরাচারি শাসক ও দাসপ্রভু, যারা ভালগার মেটিরিয়ালিজম-এ বিশ্বাসী ছিল তারা বস্তুবাদের নামেই দাসদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আবার দেখুন, দাস-দাসপ্রভু সমাজে দাসরা দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে লড়াই করল খ্রিস্টধর্মের আদর্শকে হাতিয়ার করে। তারা বলল, খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী ভগবানের কাছে সকল মানুষই সমান। দাসপ্রভুরা দাসদের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার করছে কী করে? এরা এই আচরণের দ্বারা আসলে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা এবং অনুশাসনের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছে। দাসপ্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাসদের এই লড়াইয়ে ধর্ম সেদিন নিপীড়িত, নির্যাতিত দাসদের হাতে এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। সুতরাং সেদিন সে প্রগতিশীল

ভূমিকা পালন করেছে।

ভাববাদ সত্যোপলব্ধির পথে বাধা স্বরূপ

আমাদের মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদীদের মূল লড়াই হল শোষণের বিরুদ্ধে, শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। আমাদের লড়াই সমস্তরকম শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার লড়াই। আমাদের লড়াই মানুষ হওয়ার লড়াই, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি অর্জনের লড়াই, শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করার বিরুদ্ধে লড়াই, সর্বাত্মক শোষণের হাত থেকে গণমুক্তি অর্জনের লড়াই। ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে চললেও কেউ যদি এই লড়াইতে আমাদের সাথে দু-এক কদমও ফেলতে চান, যদি কোনও তুচ্ছ বিবেচনায় লড়াই থেকে মুখ না ফেরান, তাহলে আমরা সেইসব ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলোকেও স্বাগত জানাব এই সংগ্রামে। এখানে কোনও গোলমাল করলে, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে, আসলে মূল লড়াইটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমরা যারা মার্কসবাদী তাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস থাকলে চলে না। কেন? না, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে চলার মানেই হল সত্য ধারণাকে গোলমাল করা। আমরা সত্যানুসন্ধানী, আর আজকের দিনে ধর্মবিশ্বাস সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, বিচার ও প্রমাণ ছাড়া সত্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। ধর্মবিশ্বাস এখানেই বাধা। তাছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে, যুগ যুগ ধরে এই ধর্মবিশ্বাস নিয়ে চলার ফলে এমনকী আমাদের মধ্যেও কিছু কর্মী আছেন যাঁরা যুক্তি দিয়ে মাকর্সবাদের এইসব বিষয়গুলো বোঝেন, কিন্তু নাড়ির মধ্যে সেই ধর্মীয় প্রভাব দীর্ঘদিনের অভ্যাসে তাঁদের অনেকেরই থেকে গেছে। জীবনে কোনও ব্যর্থতার সময়ে বা কোনও দুর্বল মুহূর্তে কার মনে কীভাবে যে সে দুর্বলতা কাজ করে, কখন যে কোন কর্মী ভগবানের উপর অজান্তেই নির্ভর করেন, সে খবর আর ক'জনই বা রাখছে। আমি অনেক সময়ে আর একটি কথা বলেছি, আজও আবার বলছি। যাঁরা মার্কসবাদের এতসব গভীর তত্ত্বের আলোচনা যুক্তি দিয়ে বুঝে মার্কসবাদকেই গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে ক'জন আছেন, যাঁরা সন্ধ্যেবেলায় বা গভীর অমাবস্যার রাতে তেঁতুলতলা দিয়ে যেতে পারেন, অথচ তাঁদের গা ছমছম করবে না? আমি একথাই দেখাতে চাইছি যে, অনেক সময় যুক্তি দিয়ে কোনও বিষয় গ্রহণ করার পরেও কীভাবে দীর্ঘদিনের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার সহজে কাটতে চায় না। আমরা যা বুঝলাম সেটা শুধু বোঝবার স্তরেই নয়, তাকে উপলব্ধির এমন গভীর স্তরে নিয়ে যেতে হবে যাতে আমরা সমস্ত পুরনো সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারি।

বিপ্লবী নেতার জীবন বিপ্লবের সাথে মিশে যাওয়া চাই

আমি মনে করি, আর একটি বিষয় এখানে না বলে গেলে এ সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই যেমন প্রেম, ভালবাসা, যৌনজীবন, বিবাহ এসবের প্রয়োজন আছে, বিপ্লবীদের জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। সাধারণত এই সমস্ত বিষয়কে অনেকেই ব্যক্তিগত বিষয় বলে মনে করেন এবং এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু আমি বলতে চাই, জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে যে সংগ্রামের শিক্ষা আমাদের দলে প্রতিনিয়ত চর্চা করা হয় সেটা অনুসরণ করে যে সমস্ত নেতারা পার্টির ডিসপোজালে (সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে) আছেন, অর্থাৎ পার্টির বাইরে যাঁদের অন্য কিছু নেই তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামটা এমনই হবে যে, তাঁদের গোটা জীবনটা সকল পার্টিকর্মীর কাছে স্বচ্ছ কাচের মতো অনুভূত হয়। বিপ্লবী বলে, পার্টির নিয়ন্ত্রণে আছেন বলে, তাঁদের জীবনে প্রেম-ভালবাসা-বিবাহ প্রভৃতির দরকার নেই তা নয়। কিন্তু পার্টির নিচুতলার কর্মীরা এবং ব্যাপক জনসাধারণ পার্টির উপর আস্থা রাখবে কী করে যদি তারা দেখে, এই সমস্ত নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন এমন ধরনের যেটা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়নি। নেতারা ভাল থাকুন, খারাপ থাকুন, গাড়িতে চলুন কি হেঁটেই চলুন, সেটা যাই হোক না কেন, নেতাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, জনসাধারণ সেটাই দেখতে চায়। যদি না হয় সেটা সুন্দরও হয় না, মানুষকে শক্তিশালীও করে না, বরং দুর্বল করে। এরকমভাবে চললে রাজনীতি হয়ে পড়ে একটা প্রফেশন বা পেশার মতো। কেউ হয়তো চাকরি করতেন, তার বদলে রাজনীতি করে মোড়লি করছেন। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দল ও কর্মীদের প্রতি মানুষের আবেগ হারায়, কর্মীদের সাধনা হারায়, জ্ঞানবুদ্ধি খর্ব হয়ে যায়। যারা দেশের মানুষকে জাগাবে, সাধারণ মানুষ তাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে চায়। এই আস্থা স্থাপন মানুষ তখনই করতে পারে যখন তারা দেখে, নেতারা শুধু স্লোগান দেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকেও তাঁরা যথার্থ গুরুত্ব দেন, বাহুল্য মনে করেন না। এবং একই সাথে তারা অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে, নেতারা জীবনের সমস্ত দিক

ব্যাপ্ত করেই সংগ্রাম করছেন। আমাদের মতো বিপ্লবী দলের এই দিকটির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেই হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, এসব ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেক বড় মানুষকেও কীভাবে দুর্বল করে দেয়। তাই ভারতবর্ষের মতো দেশে এ দিকটার প্রতি নজর না রাখলে দলের বিপ্লবী চরিত্র রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে পড়তে পারে।

আমি আগেই বলে গেছি, মানুষের প্রয়োজনকে কোনও একটা জায়গায় আটকে রাখা যায় না। মানুষের প্রয়োজন যেমন যেমন বেড়েছে তেমন তেমন উৎপাদন যন্ত্রেরও ক্রমাগত উন্নতি ঘটেছে, তাকে কেন্দ্র করে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক সমাজের সমস্যাগুলোর মূল কারণ ধরতে না পেরে বর্তমান এই যন্ত্রসভ্যতাকেই দায়ী করছেন এবং বলতে শুরু করেছেন, আমাদের পুরনো যুগে ফিরে যেতে হবে। এধরনের কথা গান্ধীজি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এবং আরও অনেকে বলেছেন। তাঁদের কথা থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে, সেটা হল, আমাদের দেশের অতীত সমাজটা, অর্থাৎ যখন চতুরাশ্রম ছিল, মুনি-ঋষিদের তপোবন ছিল, সেই সমাজটাই নাকি আদর্শ সমাজ ছিল। সেই আশ্রমে গেলেই নাকি মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব দেখা দিত। এঁদের মূল বক্তব্য হল, যন্ত্রসভ্যতা, কলকারখানা এসবই হল আমাদের বিপত্তির মূল কারণ। এসবের ফলেই আমাদের মধ্যে লোভ বেড়েছে, দেখা দিয়েছে যত সামাজিক বৈষম্য, যত অনাচার। আমরা বলতে চাই, এ সব কিছুরই মূল কারণ হল শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা। সামাজিক বৈষম্যই বলুন, আর অনাচার বলুন, সব কিছুরই মূল কারণ শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজব্যবস্থা। লোভ, হিংসা, দ্বেষ এসব নিয়ে মানুষ জন্মায়নি। সামাজিক পরিস্থিতিতে যখন বৈষম্য দেখা দিয়েছে, সেখান থেকেই লোভ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি জন্ম নিয়েছে। এসব কিছুই হল ইতিহাসের ফসল। শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজেই মানুষের মধ্যে এসব প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। যেদিন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়নি বা হতে শুরু করেনি, শোষক-শোষিতের জন্ম হয়নি, সেদিন আদিম মানুষ জানত না মানুষকে কীভাবে বেশি করে ঠকানো যায়, শোষণ করা যায়। তাদের মগজে এসব ভাবনা দেখা দেয়নি। কিন্তু আজ পুঁজিপতিরা, মানবতাবাদের ধ্বজাধারীরা নির্বিচারে মানুষকে চব্বিশ ঘণ্টা ঠকাচ্ছে, শোষণ করছে। তাদের কোথাও আটকাচ্ছে না। কিন্তু সেই আদিম অর্ধসভ্য মানুষরা যারা জঙ্গলে বাস করত, অভাব সত্ত্বেও সেদিন তাদের সমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়নি। মানুষকে শোষণ করার কোনও উপায় সেদিন ছিল না। আজ যাঁরা সাধারণ মানুষকে বোঝাচ্ছেন বা উপদেশ দিচ্ছেন — লোভ করো না, যেসব মানুষ পরের পয়সায় জীবনধারণ করেন, এসব কথা প্রচারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন, তাঁরা নিজেরা কিন্তু সুযোগ পেলেই মিঠাইমণ্ডা খাচ্ছেন। এইসব মানুষ একবারও ভেবে দেখছেন না, মানুষের প্রয়োজনকে যদি বেঁধে ফেলা যেত, তাহলে আজ মানুষ যেসব বিষয় জানতে পেরেছে, জীবনে যা কিছু ভোগ করছে, সেসব কোনও কিছুরই সৃষ্টি হত না। আসলে কোনও বিশেষ ব্যক্তি চেষ্টা করলে হয়তো নিজের প্রয়োজনবোধকে মারতে পারে, কিন্তু গোটা সমাজের প্রয়োজনকে কেউ মারতে পারে না। সুতরাং মানুষের প্রয়োজন ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে, এটাই হল বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা।

উৎপাদন-সম্পর্কই মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছে

তাহলে এই আলোচনা থেকে আমরা পেলাম যে, মানুষের প্রয়োজন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং উৎপাদিকা শক্তিও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তার ধাক্কায় উৎপাদন-সম্পর্ক পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে, আবার নতুন সমাজে নতুন প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। উৎপাদিকা শক্তি যেহেতু বাড়তেই থাকে, সেই বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে খাপ খায় না। উৎপাদিকা শক্তি যখন বেড়ে যায় তখন পুরনো উৎপাদন-সম্পর্ক তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। তখনই দেখা দেয় সংকট, দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এটাই হল উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্ককে ভেঙে ফেলতে চায়, নতুন উৎপাদন-সম্পর্কের বুনিয়াদ খাড়া করতে চায়। অর্থাৎ বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভাঙতে চায়, কেন না বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারে না। এমনকী সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সামনে নানা বাধাবিপত্তি দেখা দিলেও এবং মাঝেমধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে স্ট্যাগনেশন (স্থবিরতা) এলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতেই থাকবে, প্রযুক্তি উন্নত হবে, উৎপাদিকা শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। এই নিয়মকে গায়ের জোরে কেউ অস্বীকার

করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচনা হওয়া দরকার। আদিম মানুষ বাঁচার প্রয়োজনে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে উৎপাদনের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়েছিল। কার্ল মার্কস এই দিকটাকে লক্ষ করেই বলেছিলেন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক হচ্ছে উৎপাদন-সম্পর্ক। মার্কসবাদী বলে পরিচিত অনেক নেতাদের এই উৎপাদন-সম্পর্ককে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলতে শুনেছি। আমি মনে করি, উৎপাদন-সম্পর্ককে অর্থনৈতিক সম্পর্ক হিসাবে বলার মানে মার্কসবাদের ভালগারাইজেশন (বিকৃতি)। মার্কস একথা বলতে চাননি। উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণাটা অতটা সীমিত নয়। একথা ঠিক, মানুষ আরও ভালভাবে বাঁচবার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়ে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে উৎপাদন করার জন্যই। নিজেদের বিকাশের প্রয়োজনেই, উৎপাদন করতে গিয়েই মানুষ সমাজবদ্ধ হল, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হল। কিন্তু এই উৎপাদন শুধু বস্তুগত উৎপাদন নয়, তা একই সাথে বস্তুগত ও ভাবগত উৎপাদন। আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যারা বস্তুগত উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে তারাই ভাবগত উৎপাদনকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু এই দিকটাকে খেয়ালে না রেখে আমরা যদি উৎপাদন-সম্পর্ককে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা অর্থকরী সম্পর্ক বলেই মনে করি, তাহলে সেটা হবে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ। মনে রাখতে হবে, কোনও ভাবগত সম্পর্ক , সেটা ভালবাসাই হোক অথবা অন্য কিছু হোক, সেটা বস্তুগত উৎপাদনের উপরিকাঠামো। বস্তুগত উৎপাদন হল ভিত, আর ভাবগত উৎপাদন হল তার উপরিকাঠামো। বস্তুগত উৎপাদন এবং ভাবগত উৎপাদনকে এভাবেই বুঝতে হবে। উৎপাদন-সম্পর্ক বলতে মার্কস আর্থিক দাসত্ব বা অর্থের জন্য সম্পর্ক বোঝাতে চাননি। মানুষ শুধু মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপকরণই তৈরি করে না, মানুষ প্রতিমুহূর্তে অনেক কিছু সৃষ্টি করতে চায়। নরনারীর সম্পর্ক, ভালবাসা, পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, সাংস্কৃতিক জগৎ বা সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিল্পসাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে নিত্যনতুন সৃষ্টি করতে চায় জীবনকে সুন্দর করার জন্য। আমরা যেমন বস্তুগত উৎপাদনকে ভোগ করি, আবার আমাদের জীবনে এইসব ভাবগত উৎপাদনেরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে — যার সাথে রুচি, সংস্কৃতি, শিক্ষার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। আদর্শ, মূল্যবোধ, এথিক্স, মর‍্যালিটি, শিক্ষা, বিচারশাস্ত্র এই সব কিছুই উৎপাদন-সম্পর্কের সাথেই জড়িত, কিন্তু সেটা বস্তুগত উৎপাদন নয়, ভাবগত উৎপাদন।

শ্রেণী, দল ও বিপ্লবকে না ভালবাসলে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী জীবনে জনগণের প্রতি ভালবাসা ও পার্টির প্রতি ভালবাসার প্রশ্নটিও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। অনেকে মনে করেন, তিনি যেহেতু জনগণকে ভালবাসেন, শ্রমিকশ্রেণীকে ভালবাসেন তার মানেই তিনি একজন বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট। আমি মনে করি, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেন না বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের মধ্যেও অনেকেই আছেন যাঁরা জনগণকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, মানুষের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন না, বা হতে পারেননি। যে কোনও প্রকৃত কমিউনিস্টেরই জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ভালবাসা না থেকে পারে না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এই ভালবাসা নিছক ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু নয়। যে পার্টি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবে, সেই পার্টির নেতা ও কর্মীরা যদি জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ভালবাসাকে শ্রমিকশ্রেণীর দলের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত করতে না পারেন, তাহলে তাঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিপ্লবী চরিত্র গড়ে উঠবে না। কারণ, তাঁদের মনে রাখা দরকার, ভালবাসার সেই রূপ বিশেষীকৃত হচ্ছে, মূর্ত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর দলের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে। তাই সেই দলকে যাঁরা ভালবাসতে পারেন না, ছোটখাট ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিগত কারণ, অথবা তুচ্ছ মতপার্থক্য দেখা দিলেই যাঁরা পার্টির প্রতি মমত্ববোধ হারিয়ে ফেলেন, অতি সহজেই দলকে ধূলায় মিশিয়ে দেন, তাঁরা বিপ্লব বুঝতে পারেননি। যেমন শ্রেণীকে না ভালবাসলে শ্রেণীতত্ত্ব আয়ত্ত করা যায় না, সেইরকম শ্রমিকশ্রেণীর দলকে ভাল না বাসলে শ্রেণীতত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না। শুধু তর্ক করে, আলাপ-আলোচনা করে এর সন্ধান পাওয়া যায় না। আমি বলব, যাঁরা বিপ্লবের দায়িত্ব বহন করতে চান তাঁদের যেমন মার্কসবাদের নানা বিষয় নিয়ে ক্রমাগত চর্চা করতে হবে, পড়াশুনা-আলাপ-আলোচনা করতে হবে, একইসাথে দলের দায়িত্বও তাঁদের অতি অবশ্য বহন করতে হবে। একটা ক্লাস বা স্কুলে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় দর্শন ও বিপ্লবী দল গঠন সংক্রান্ত আমাদের যে

ন্যূনতম শিক্ষা তার সবকিছুই আপনারা আয়ত্ত করে ফেলবেন, বিষয়টা এত সহজ নয়। তাই অন্য সমস্ত দলের সাথে বিপ্লবী দলের মূল পার্থক্য কোথায়, আজকের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদের যুগে একটা শ্রমিকশ্রেণীর দল গঠনের যথার্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত পদ্ধতি কী, এরকম বহু বিষয় আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ কী এবং ভারতবর্ষের বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামোতে এদেশের বিপ্লবের যথার্থ রণনীতি-রণকৌশল কী হবে। এ সমস্ত কিছুই আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে।*

মার্কসবাদ শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণ নয়, মার্কসবাদ হল সামগ্রিক জীবনদর্শন

পার্টিকে ভালবাসার অর্থ হল, যাঁরা পার্টিকে ভালবাসেন তাঁরা এর মধ্যে ব্যথা এবং আনন্দ দুটোকেই সমানভাবে উপভোগ করেন। বিপ্লবটা যে ভাববিলাসিতা নয় এবং বিপ্লবের জন্য পার্টিকে যে শক্তিশালী করতে হবে, এটা তাঁরা জানেন। যে কর্মীটি পার্টিকে ভালবাসে সে যে বিপ্লবের জন্য প্রাণ দেয়, তার সেই প্রাণ দেওয়াটা ঘটে পার্টির জন্যই। এই হল তার সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়ার অভিব্যক্তি। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, কংক্রিটাইজড্ এক্সপ্রেশন অব ক্লাস ফিলিং ইজ পার্টি ফিলিং অ্যান্ড কংক্রিটাইজড্ এক্সপ্রেশন অব লাভ ফর দ্য ক্লাস অ্যান্ড রেভোলিউশন, ইজ লাভ ফর দ্য পার্টি (শ্রেণীর প্রতি আবেগের বিশেষীকৃত প্রকাশ হচ্ছে দলের প্রতি আবেগ এবং শ্রেণী ও বিপ্লবের প্রতি ভালবাসার বিশেষীকৃত প্রকাশ হচ্ছে পার্টির প্রতি ভালবাসা) । এই হচ্ছে মার্কসবাদের একটা মূল কথা। এই সংগ্রামে দায়িত্ব পালন আছে, ঝঞ্ঝাট আছে, কিন্তু সেগুলো সকলেই ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে আলাপ-আলোচনা করে সমাধান করছে। কেউ একা লড়ছে এমন নয়, সকলের সাথে মিলেমিশে লড়ছে। আলাপ-আলোচনা, মেলামেশা সবকিছুর সাহায্যেই সমাধান করছে। যদি দেখা যায়, কেউ একজন শুধু পড়ছে, কিন্তু লড়ছে না, দায়িত্ব বহন করছে না, লড়াই চালাচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে সে জানা আসলে ভুল জানা। এভাবে জানার বিপদ হচ্ছে, এতে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে না, বরং ইগো বাড়ে এবং বিভ্রান্তি বাড়ে। এ আমাদের পদ্ধতি নয়। মার্কসবাদী পদ্ধতিতে শেখা কথাটার মানে কী ? এই কথার অর্থ, একজন যা শিখল বা সত্য বলে জানল সে জীবনে সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করছে, অপরকে শেখাচ্ছে। যেমন করে শেখালে অপরে শিখবে তেমন করে শেখাবার চেষ্টা করছে, তেমন করে শেখাবার কায়দা আয়ত্ত করার জন্য লড়ছে। ঘরে-বাইরে, বন্ধুদের সাথে, অফিসে, কাছারিতে, যেখানে যার সাথেই সে মিশুক না কেন, সকলেই বুঝতে পারবে, শুধু পার্টি মিটিং বা আলাপ-আলোচনাতেই নয়, এটাই হল তার জীবনবেদ। এই জন্যই মার্কসবাদকে বলা হয় জীবনদর্শন। এটা একটা অর্থনৈতিক তত্ত্ব শুধু নয়। মার্কসবাদ জীবনকে পরিবর্তিত করে এবং গোটা সমাজের উন্নতির জন্য লড়াই করতে শেখায়। দ্বন্দ্বের মধ্যে আনন্দ নিতে শেখায়। দুঃখের মধ্যেও যে কী আনন্দ তা উপভোগ করতে শেখায়। এ জিনিস যে উপলব্ধি করতে পারে না, সে শুধু দুঃখ দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়।

জানা ও উপলব্ধি করার মধ্যে পার্থক্য বিরাট

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বোঝা দরকার। স্মরণশক্তি থাকার ফলে মানুষ অনেক কথা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে এবং সেই কথাগুলো আবার শোনাতে পারে। কিন্তু এটা পারে বলেই একথা প্রমাণ হয়ে যায় না, তাদের সকলের মধ্যে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে উপলব্ধি খুব গভীর আছে। প্রায়শই দেখা যায়, যাঁরা তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির জোরে অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন তাঁদের তত্ত্বের প্রশ্নেই হোক বা অন্য যেকোনও ক্ষেত্রেই হোক, আমরা বেশ জ্ঞানীগুণী বলে ধরে নিই। এধরনের বিভ্রান্তি প্রায়ই দেখা যায়। তাই স্মরণশক্তি ও যথার্থ উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বা কতটুকু সেটা সঠিকভাবে বুঝতে হলে দেখতে হবে, যেকথা এই সব ব্যক্তিরা মুখে বলছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের রুচিসংস্কৃতির জায়গাটা উন্নত হচ্ছে কিনা। কেননা, এই রুচিসংস্কৃতির ধাঁচাটা উন্নত না হলে যা আমরা বলছি তা জীবনে যথার্থ প্রয়োগ করছি কিনা সেটা বোঝা যাবে না। বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণ পার্টির কাজে যুক্ত থাকলেই তার দ্বারা বোঝা যায় না, জীবনে

---

* তদানীন্তন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির মূল্যায়ন, নারীসমাজের ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণীর দলগঠন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি, যা শিক্ষাশিবিরে আলোচিত হয়েছিল, তা এখানে রাখা হয়নি।

বিপ্লবী আদর্শের যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নেতার অবস্থান কোথায়। আমার এই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন। নাহলে দেখুন, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা, মাস্টারমশাইরাও তো অনেক কিছু মুখস্থ রাখতে পারেন, অপরকে শেখাতেও পারেন, কিন্তু তাঁদের অনেকের জীবনেই তার কোনও প্রভাব নেই। এ হল অনেকটা ভুক্ত বস্তু উগরে দেওয়ার মতো। এজন্যই মার্কসবাদ বলেছে, জানা এবং উপলব্ধির মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্যটা সঠিকভাবে ধরতে পারলেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কী সেই কারণ যার জন্য আমরা একজনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তাঁর মার্কসবাদ নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি এবং ইনটেলেকচুয়াল ফ্যাকালটি (মেধাশক্তি) থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন এসব নিয়ে আলোচনা করেন সে আলোচনায় কোথায় যেন একটা অভাব থেকে যায়। বিষয়টা ঠিক মনের মধ্যে গেঁথে যায় না। অথচ আর একজনের ঐরকম ডিগ্রি না থাকলেও সে যখন কথা বলে সেটা যেন মনের ভিতরে দাগ কেটে যায়। প্রথম স্তরের লোকেরা অনেক সময় অপরের দেওয়া কোনও রেফারেন্সে-এর (তথ্যের) ভুল ধরে সেই ভুলটাকেই বড় করে দেখান। কিন্তু তিনি একবারও খেয়াল করেন না, তিনি যে তথ্যটা দিচ্ছেন সেটা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তেমন ফল পাচ্ছেন না, যেটা হয়তো একটা ভুল তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও আর একজন হাতেনাতে ভাল ফল পেল। শুরুতে প্রথম স্তরের কমরেডদের এ নিয়ে তেমন সমস্যা হয় না। কিন্তু প্রথম স্তরের কমরেডরা যদি তাঁদের ভুল সংশোধন করতে না পারেন, এমন একটা সময় আসে যখন তাঁদের মধ্যে অহংবোধ মারাত্মকভাবে দেখা দেয় এবং তাঁরা অহংসর্বস্ব হয়ে যান, নিজেদের অ্যাসেস (মূল্যায়ন) করার ক্ষমতাও তখন তাঁদের কমে যায়। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁদের মনে প্রচুর কাদামাটি জমে যায়।

তাই আমি কমরেডদের বলব, প্রতিমুহূর্তে নিজেকে প্রশ্ন করতে যে, তাঁরা যা বলছেন সেটা সত্যিই বুঝেছেন কি? যদি বুঝে থাকেন, তাহলে জীবনে তার প্রয়োগ হবে, তার ফল দেখতে পাওয়া যাবে। তাই বলছি, পড়া, আলোচনা করা, তর্ক করা এগুলো যখন জীবনকে কেন্দ্র করে যে সর্বব্যাপক সংগ্রাম সেই সংগ্রামেরই একটা অংশ হিসাবে আসে তখনই সেটা কাজে লাগে। কেউ যদি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সংগ্রাম না করেন, দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে সেই সব আলোচনা, তর্ক বা পড়াশুনার কোনও মানে নেই। শুধু পড়ছি, আলোচনা করছি, সন্ধেবেলায় পার্টি অফিস যাচ্ছি, আর পার্টির কাজকর্ম একটু ঢিলেঢালাভাবে যখন যা করার করছি, এই মনোভাব নিয়ে পড়া এবং তর্কবিতর্ক যাই করি তাতে আমরা অনেক কথা শিখি বটে, কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন কিছুই করি না। আবার বলি, কেউ জ্ঞান অর্জন করেছে মানেই ক্রিয়ার মধ্যে সে অবস্থান করছে। বিষয়টা এমন নয় যে, আমি জ্ঞান অর্জন করছি, তারপর দিনক্ষণ দেখে কবে লড়াই শুরু করব সেটা ভাবছি। বিষয়টা এমন হতে পারে না। আমি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি ততটুকু লড়াই করছি। ভুল হলেও লড়ছি। লড়াইয়ের মধ্যেই আমার আনন্দ। সেই লড়াইতে যে দুঃখ সেই দুঃখের মধ্যেও আনন্দ। দুঃখও আনন্দের একটা রূপ হতে পারে। যে লড়তে জানে, যে জ্ঞানী, সে জানে দুঃখ ও আনন্দ মাসতুতো-পিসতুতো ভাই। আনন্দের মধ্যেই দুঃখ, দুঃখের মধ্যেই আনন্দ। আমাদের দেশের একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রও একথাটা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, ভয়শূন্য যে দুঃখ তাকে আনন্দের মতোই উপভোগ করা যায়। এখানেও দেখুন, সেই সংগ্রামের, সেই লড়াইয়ের সুর। ভয়শূন্য যে দুঃখ — এই কথাটার মানে হচ্ছে নির্ভীকভাবে কোনও একটা কাজ যদি কেউ একটা স্থির সংকল্প নিয়ে করে, একটা মূল্যবোধের জন্য লড়ে, তাহলে তার বেদনাটা শুধু নিছক বেদনা নয়, আনন্দময় একটা রূপ তার আছে। যারা ভীত, সন্ত্রস্ত্র, দ্বিধাগ্রস্ত তাদের কাছে দুঃখটা হচ্ছে সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মক। দুঃখ তাদের ছেয়ে ফেলে, আনন্দ তারা দেখতে পায় না।

বিপ্লবী জীবনে দুঃখও আনন্দের আর একটা রূপ

এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যাদের প্রচুর পয়সা আছে, এমন অঢেল পয়সা আছে যে পয়সা কীভাবে খরচ করবে সেটা তারা জানে না, তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভাবেন, এই মানুষগুলোর কত আনন্দ, কেমন সুখে তারা আছে ! তাঁরা মনে করেন, এদের আবার অভাব কীসের? কিন্তু সাধারণ মানুষ যাই ভাবুন, এমন যারা উচ্চবিত্ত, যাদের টাকাপয়সার কোনও অভাব নেই, বাস্তব জীবনে প্রায়ই দেখা যায় তাদের অনেকের মধ্যেই আনন্দ নেই, সুখ নেই। তারা অনেকেই স্কিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। প্রচণ্ড মানসিক অশান্তি ভোগ করছে। তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মনে আনন্দ নেই। তারপর গিয়ে কোনও সাধুবাবার পায়ে ধরছে যদি আনন্দ

কিছু পাওয়া যায়, যদি মোক্ষলাভ হয়। কোনও কিছুতেই এদের আনন্দ নেই, কারণ তারা সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়েছে। তারা সব পরগাছা। তারা মানব সভ্যতার গ্লানি ও কলঙ্ক। মানুষের সংগ্রামের সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। সমাজের সমস্ত সম্পদ চোরের মতো আত্মসাৎ করে, মানুষকে ঠকিয়ে তারা নিজেরা উপভোগ করছে। এতেও তারা বাঁচে না। তাদের মন মরে, শিক্ষা মরে, সংস্কৃতি মরে, শান্তি মরে, তারা কোনও কিছুতেই শান্তি পায় না।

কিন্তু উল্টো দিকে তাকিয়ে দেখুন। ভিয়েতনামের জঙ্গলে যারা লড়াই করেছে, তাদের রাতে ঘুম ছিল না, যে কোনও মুহূর্তে বোমা পড়তে পারে বলে যাদের রাইফেল কাঁধে সারারাত সজাগ থেকে লড়তে হয়েছে, অথবা দুনিয়ার ইতিহাসে যত বিপ্লবী মাঠেঘাটে লড়েছে, তারা কখনও হয়তো ভাল থেকেছে কখনও থাকেনি, তাদের কখনও খাওয়া জুটেছে কখনও জোটেনি। কিন্তু খাওয়া জুটলো কিনা, কোনও কিছুর অসুবিধা হল কিনা, পান থেকে চুন খসলো কিনা, আরামে থাকা হল কিনা তা নিয়ে তাদের কোনও মানসিক বিকার ছিল না। তাদের জীবনগুলো দেখুন। তারা কেউ স্কিজোফ্রেনিয়ায় ভোগেনি। তারা ছিল অতলান্ত প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। এই যে লোকগুলো তাদের কি দুঃখ-ব্যথা কিছু ছিল না ? হ্যাঁ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দের সাগরে তারা ডুবে ছিল। তার কারণ, দুঃখও তাদের কাছে ছিল আনন্দের একটা রূপ। দুঃখকে তারা আনন্দের মতো উপভোগ করতে জানত।

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে বদলে দেয়

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বলে যেতে চাই। পুঁথিগত বিদ্যা আর কিছু তর্ক করার ক্ষমতা, বা কিছু তথ্য দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেই তাকে জ্ঞানী বলা যায় না। বিশেষ করে কেউ যদি ইংরেজি জানেন, আর তাঁর যদি স্মরণশক্তি ভাল থাকে, পড়াশুনো করার একটা ঝোঁক ও উদ্যোগ থাকে, তাহলেই তিনি অনেক কিছু আওড়াতে পারেন। কিন্তু তার দ্বারা তাঁর মধ্যে সত্যিকারের উপলব্ধি কতটা ঘটেছে তা বোঝা যায় না। আসলে যথার্থ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের মধ্যে পার্থক্য কী, এটা অনেকেই ধরতে পারেন না। পাণ্ডিত্য হচ্ছে অনেকটা বোঝার মতো, এক অর্থে সেটা নিষ্ফলা। কিন্তু জ্ঞান এবং সংগ্রাম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

অথচ ভাববাদীরা, পুঁজিপতিরা, পরগাছারা যুগে যুগে ভাবকে করে ফেলেছে তাদের বিলাসিতার সামগ্রী, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন মানসিক বিলাসের একটা উপকরণ। জীবনে তার কোনও প্রয়োগ নেই, শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা। কিন্তু যে মানুষ এগোতে চায়, যে মানুষ আশাবাদী, যে মানুষের জীবনের প্রতি বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে, যে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যেতে চায়, সে মানুষের এমন জ্ঞান দিয়ে কাজ হবে না। তাই ক্রিয়াহীন যে জ্ঞান সেটা জ্ঞানের নামে কুজ্ঞান। সেটা এক ধরনের ভাঁড়ামি। সে জ্ঞান অনেক সময় মানুষের চিন্তার যে স্বাভাবিক গতি, সাবলীল গতি, চিন্তা করার যে পদ্ধতি তাকেই গুলিয়ে দেয়, মানুষকে অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ করে। তাই তেমন জ্ঞান যথার্থ অর্থে জ্ঞানই নয়।

সংগ্রামহীন জ্ঞান অলস বিলাসিতা

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান বা চিন্তাও একটি ক্রিয়া। যে চিন্তা বা জ্ঞান, ক্রিয়া বা সংগ্রামের সাথে যুক্ত নয়, সেটা অলস বিলাসিতা। অনেক সময় দেখা যায়, একজন লোক মহাপন্ডিত, কিন্তু কমপ্লিটলি মাডল্ড্ (সম্পূর্ণ তালগোল পাকানো)। তিনি অনেক পড়াশুনা করেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত অধীত বিষয়গুলিকে ইনটিগ্রেট (সংযোজিত) করতে বা মেলাতে পারেননি, অর্থাৎ সিস্টেমেটাইজ (শৃঙ্খলাবদ্ধ) করে, ব্যালেন্স করে (ভারসাম্য বজায় রেখে) বিষয়গুলোকে ধরতে পারেননি। তিনি একসময়ে যা ভাবেন, ঠিক পরের মুহূর্তেই তার ঠিক উল্টোটা ভাবছেন। আমি এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে যেতে চাই। সমস্ত কমরেড বিভিন্ন বিষয় খুব মন দিয়ে পড়ুন, ভাল করে পড়ুন, এটা আমি চাই। এই যে আমরা পড়াশুনো করছি বা করতে বলছি, সেটাও আমাদের সংগ্রাম পরিচালনারই একটি অঙ্গ। একথা কেন বলছি? না, আমরা দায়িত্ব বহন করছি, লড়াই পরিচালনা করছি, সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের কথাগুলো পৌঁছে দিচ্ছি, তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি, তাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নিজেদেরও আমরা তৈরি করছি, শিক্ষিত করে গড়ে তুলছি। এখানে পড়াশুনো করাটা একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং প্রত্যয় গড়ে উঠছে। এটার জন্য প্রয়োজন আমাদের চিন্তাভাবনাকেও

সুবিন্যস্ত করা। অবিন্যস্ত চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারলে চিন্তার ক্ষেত্রে নানা ধরনের জট দেখা দেয়, মেন্টাল ডিসঅর্ডার (মানসিক বৈকল্য) দেখা দেয়। তাই আমরা প্রসেস অব থিংকিং-এর (চিন্তাপদ্ধতির) উপর এত জোর দিই।

আর একটা কথা আপনাদের বুঝতে হবে। তা হচ্ছে, বিপ্লব মানে কী? কোনও বিশেষ কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ করার নাম কি বিপ্লব? না । একটা সমাজ পরিবর্তনের দ্বন্দ্বের ধারা-প্রতিধারার সফল পরিণতি হল বিপ্লব। যুগ যুগ ধরে বিপ্লব আসছে, বিপ্লব হয়ে চলবে। তাই বলছি, বিপ্লব হল ক্রমাগত সাধনা ও সংঘর্ষ, একটা বিরামহীন সংগ্রাম, এর শেষ নেই, এ একটা হায়ার ফর্ম অব স্ট্রাগল (উচ্চস্তরের সংগ্রাম)। আপনারা ভাবছেন, আজকের লড়াইটা খুব কঠিন। কিন্তু সমস্ত মহান কমিউনিস্ট নেতারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, বিপ্লবের পর তাকে রক্ষা করা, সংহতকরা আরও কঠিন। বিপ্লব-পূর্ববর্তী সংগ্রামের মধ্যে উত্তেজনা আছে, আঘাত আছে। সে লড়াই করা এক অর্থে অনেক সহজ। বিপ্লবের পরে আরামের সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ বেশি। সেখানে উত্তেজনার খোরাক কম। তখন রাষ্ট্রশক্তি আর প্রত্যক্ষ শত্রু থাকে না। তখন লড়াই করতে হয় অপ্রত্যক্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে কোনও বিচ্যুতি ঘটল কিনা সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় এবং সামান্যতম বিচ্যুতির হাত থেকেও তাকে রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এক নতুন ধরনের সংগ্রামে প্রবেশ করতে হয়। এই যে আদর্শগত লড়াই যেটা বিপ্লবের আগেও করতে হয়েছে, সেটা কি খুব সহজ লড়াই? বিপ্লবের আগে লড়াইটা শুধু রাজনৈতিক লড়াই ছিল না, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও লড়তে হয়েছে। এই যে সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব সেটা বিপ্লবের আগেও যেমন দরকার, সেই বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য বিপ্লবের পরেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তীব্র আদর্শগত লড়াই প্রয়োজন। মার্কসবাদের এটা বুনিয়াদি শিক্ষা। তাই রুশ বিপ্লবের আগে লেনিনকে মাখ্-এর বিরুদ্ধে, টলস্টয়-এর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, এমনকী প্লেখানভ-এর বিরুদ্ধেও কলম ধরতে হয়েছে। শুধু অর্থনীতির উপর কেতাব লিখেই হয়নি। বিপ্লবটা যদি শুধু অর্থনৈতিক লড়াই হত তাহলে আমাদের এত কিছু আলোচনার দরকার ছিল না। দর্শনের এত তত্ত্বের মধ্যে ঢোকারও কোনও প্রয়োজন ছিল না।

বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যের শক্তি অপরাজেয়

আর একটি বিষয় আলোচনা করেই আমি শেষ করব। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে এস ইউ সি আই গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গেপার্টির সমস্ত কর্মীকে একটি বিষয়ে আমি সচেতন করতে চাই। তা হচ্ছে, যে জনগণের জন্য আপনারা লড়ছেন, বহু সময় সেই জনগণের অনেকেই আপনাদের টিটকিরি দেবে, হয়তো বা মারধোর করবে — এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এস ইউ সি আই কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যে জনগণের জন্য আপনারা লড়ছেন, আপনাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য না বুঝে বা ভুল বুঝে তারা আপনাদের অবমাননা করতে পারে। দুনিয়ার ইতিহাসে সকল বিপ্লবী আন্দোলনকেই প্রথম দিকে এইসব সহ্য করতে হয়েছে। এতে পিছিয়ে পড়ার কিছু নেই। একথা জেনেই আমরা নেমেছি যে, এই আন্দোলনে অনেক ঝঞ্ঝাট। বিপ্লবের এই সাধনায় তাই অনেক শক্তির দরকার। সে শক্তি হল জ্ঞানের শক্তি, সাধনার শক্তি, বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য ও প্রত্যয়ের শক্তি, আর উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের শক্তি। এটা শুধু নিজের মুক্তির জন্য নয়, সমস্ত মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়েই নিজের মুক্তি অর্জনের জন্যই এটা প্রয়োজন। আপনারা সকলে সেই সংগ্রামে অনেক বেশি দায়িত্ব নেবেন, নিজেদের যথার্থ ও উপযুক্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে তৈরি করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকবেন — আপনাদের সকলের উদ্দেশে এই আবেদন জানিয়ে আমি এই স্কুল শেষ করছি।

১৯৬৭ সালের ১৪ -১৭ অক্টোবর পার্টির
কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে মুসলিম
ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক
শিক্ষাশিবিরে প্রদত্ত ভাষণ।
২০০৬ সালের ৫ আগস্ট
পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।